শর'য়ী বিধান

মূলনীতি ও প্রয়োগ

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন

লেখক পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার দক্ষিণ জলদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী মনির আহমদ সওদাগর। তিনি ছাত্র জীবনের শুরু থেকে প্রতিটি স্তরই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রথম শ্রেণীতে 'দাখিল' ও 'আলিম' পাশ করে মিশরস্থ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য অর্জন করেন স্কলারশিপ। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'য়াহ ও আইন অনুষদ থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য মিশর সরকারের 'মিশর-বাংলাদেশ কালচারাল এক্সেইঞ্জ স্কলারশিপ' অর্জন করে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী আইনে প্রথম শ্রেণীতে অর্জন করেন মাস্টার্স ও এম.ফিল. ডিগ্রি। তাঁর এম.ফিল. অভিসন্দর্ভে গবেষণার বিষয় ছিল 'Mohammad Anwar Shah Al-Kashmiry (1292-1352 H.) And His Efforts in Hanafi School'। অতঃপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভে গবেষণার বিষয় ছিল 'Rules of Shariah Regarding Online Contract: A Comparative Fiqh Study'।

কর্মজীবনে তিনি ২০১২ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর আইন অনুষদভুক্ত আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। একই বিভাগে ২০১৫ সালে সহকারী অধ্যাপক ও ২০১৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন।

ফিকহ্, উসূলে ফিকহ্, তুলনামূলক ফিকহ্, ইসলামী অর্থনীতি, মাকাসিদুশ-শারী'য়াহ, হালাল ফুড, অন-লাইন লেনদেন ও সমসাময়িক বিষয়ে ইসলামী আইনের বিধানসহ ইসলামী নানা বিষয়ে তাঁর বহু গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি মিশর থেকে প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন। তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থায়নে একাধিক গবেষণা প্রকল্প লাভ করেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

শর'য়ী বিধান : মূলনীতি ও প্রয়োগ

[Shariah Rules : Principles and Applications]

শরয়ী বিধান : মূলনীতি ও প্রয়োগ

[Shariah Rules : Principles and Applications]

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক
আল-ফিক্হ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

মাকতাবাতুল হাসান

الحكم الشرعي : تأصيل وتطبيق

(باللغة البنغالية)

إعداد

الدكتور محمد ناصر الدين (الأزهري)

الأستاذ المشارك

قسم الفقه والدراسات القانونية

الجامعة الإسلامية (الحكومية) كوشتيا، بنغلاديش.

শর'য়ী বিধান : মূলনীতি ও প্রয়োগ
প্রথম প্রকাশ : জিলহজ্জ ১৪৪২/জুলাই-২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
ISBN : 978-984-8012-80-2
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২০০/- টাকা মাত্র

USD : 4 $

Sharyee Bidhan : Mulneeti o Proyug
[Shariah Rules : Principles and Applications]
By Dr. Mohammed Nasir Uddin
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com I fb/Maktabahasan

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামাতাকে।

সূচিপত্র

উৎস থেকে শরী'য়াহ আইন বুঝার কতিপয় পরিভাষা : শব্দ ও এর ব্যবহার বিধি সম্পর্কিত

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله منزل الأحكام، مشرع الحلال والحرام وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد مرشد الأنام، وعلى آله وأصحابه حملة الشريعة الأعلام، ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة.

ইসলামী শরী'য়াতের মৌলিক ও সম্পূরক দলীলসমূহ থেকে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধানসংক্রান্ত জ্ঞানকে 'ফিক্হ' বা ইসলামী বিধান শাস্ত্র বলা হয়। 'ফিক্হ' শাস্ত্রের উৎসগত মূলনীতির নাম 'উসূলুল ফিক্হ'। যা কতগুলো মূলনীতি ও প্রতিপাদ্যের সমষ্টি, যেগুলোর মাধ্যমে প্রামাণ্য বিস্তারিত দলীলসমূহ থেকে শরী'য়াতের বিধিবিধান উদ্ঘাটন করা, 'ফিক্হ' শাস্ত্রের শাখাপ্রশাখাসমূহ ও তার অনুকূলে প্রদত্ত দলীলগুলোর প্রামাণ্যঅবস্থা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। ইসলামী ফিক্হ ও ইসলামের বিধান সম্পর্কে জানতে হলে এবং কালের বিবর্তনে উদ্ভূত নতুন নতুন বিষয়াদির শরী'য়াতসম্মত সমাধান উদ্ভাবন করতে হলে অবশ্যই ইসলামী উসূলুল ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা জরুরী। উক্ত শাস্ত্রের অন্যতম অধ্যায় হচ্ছে; বিধানসমূহের জ্ঞান, এর উৎসগত নীতিমালা, পদ্ধতি ও প্রয়োগ। যেকোনো বিষয়েরই হুকুম বা বিধান রয়েছে। সেসব বিষয়ের বিধান জানার পূর্বে অবশ্যই বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা জরুরী।

এ গ্রন্থে 'শর'য়ী বিধান'-এর আদ্যোপান্ত আলোচনা করা হয়েছে। 'আল-হুক্ম আশ-শর'য়ী বা 'শর'য়ী বিধান' ও এর প্রকারভেদ; ফরয, ওয়াজিব, মানদূব, হারাম, মাকরূহ, অনুত্তম, মুবাহ, সাবাব, শর্ত, মানি, সহীহ, বাতিল, ফাসিদ, আযীমাত, রুখসাত ইত্যাদির পরিচয়, সনাক্তের কৌশল, স্তর, যোগ্যতা, অন্তরায়, পার্থক্য প্রভৃতির তত্ত্ব ও তথ্য এবং প্রয়োগপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামী আইনের বিধিবিধানসমূহকে এর মৌলিক উৎস থেকে বুঝার জন্য 'নাস' তথা কুরআন-সুন্নাহর মূল বক্তব্যের শব্দাবলি ও এর সুনির্দিষ্ট অর্থ, তাৎপর্য, পরিপ্রেক্ষিত, ব্যবহারবিধি সম্পর্কিত কতক প্রয়োজনীয় (সিলেবাসভুক্ত) উসূলী পরিভাষা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাশাপাশি এটি যেহেতু 'উসূলুল ফিক্হ'-সংক্রান্ত গ্রন্থ সেহেতু এতে 'উসূলুল ফিক্হ'-এর পরিচিতি, আলোচ্য বিষয়, উপকারিতা, 'উসূলুল ফিক্হ' ও 'কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ'-এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান জ্ঞান-গবেষণার উন্নতির যুগে যখন প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই শর'য়ী বিধান বা 'হুকমে শর'য়ী' সম্পর্কে বিশদ আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম; কারণ মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'য়াহর বিধিবিধান জানা অপরিহার্য। মুসলিমরা জীবন অতিবাহিত করার পথে নানা সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধান কীভাবে করবে, তারই পথিকৃৎ হচ্ছে 'হুকমে শর'য়ী'। এই হুকমে শর'য়ী ছাড়া দৈনন্দিন ইসলামী জীবনযাপন করা সম্ভব নয়; কারণ মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কীভাবে জীবন-পথে চলবে, কীভাবে বিধানাবলি তথা করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে পরিচিত হবে, কীভাবে করণীয় ও বর্জনীয়গুলোর পর্যায় ও স্তর সম্পর্কে জ্ঞাত হবে, কীভাবে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয়াদির ধাপ সম্বন্ধে অবগত হবে, এতদসংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসার যথাযথ নিষ্পত্তিই হচ্ছে শর'য়ী বিধান সম্পর্কে সমুদয় ও যথার্থ জ্ঞান। তাই এই বিষয়টি অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'র আইন অনুষদভুক্ত আল-ফিক্হ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে আমি দীর্ঘদিন থেকে বিষয়টি পাঠদান করে আসছি। একজন ফিক্হের ছাত্র হিসাবে এই বিষয়ে মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'য়াহ ও আইন অনুষদে স্নাতক পর্যায়ে এই বিষয়টি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। তা ছাড়া আমার ছাত্ররা তাদের এ বিষয়ে বাংলায় স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ লেখার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকে। তাই এ গ্রন্থটি মূলত একটি অ্যাকাডেমিক কাজ। আমার এ কাজের উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিষয়টি যথাসাধ্য সহজভাবে উপস্থাপন করা।

এ গ্রন্থটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আলোচনা, পর্যালোচনা, নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর আলোকে প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকৃত গবেষণা রীতিনীতির আলোকে নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এ ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ব্যবহারে প্রচলিত 'অ্যাকাডেমিক গবেষণারীতি' অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যের মধ্যে

আল-কুরআন, তাফসীর, হাদীসগ্রন্থ, হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ইসলামী উসূলে ফিক্হ ও ফিক্হ শাস্ত্রের মৌলিক ও আধুনিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি এবং বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত আধুনিক অ্যাকাডেমিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'বাংলা একাডেমি' প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। আরবী ভাষার ক্ষেত্রে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রণীত প্রতিবর্ণায়নের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তবে বহুল প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। বলা বাহুল্য, যেকোনো লৌকিক কাজে ভুল হওয়া/থাকা স্বাভাবিক। তাই বিজ্ঞ পাঠকগণের কাছে আমি একান্তভাবে প্রত্যাশা করব, এ গ্রন্থের কোথাও কোনো ধরনের ভুলত্রুটি চোখে পড়লে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন। আমি আমার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে আগ্রহী।

মহান আল্লাহ্! দয়া করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন, ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন, এ কাজটুকু আমার এবং আমার পিতা-মাতা, পরিবার, শিক্ষকগণ, আত্মীয়-স্বজনের জন্য আখিরাতে নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। এ গ্রন্থ লিখতে ও প্রকাশ করতে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আমীন!

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন

উসূলুল ফিক্‌হ পরিচিতি

উসূলুল ফিক্‌হ-এর আভিধানিক সংজ্ঞা

উসূলুল ফিক্‌হ (أصول الفقه) একটি মুরাক্কাব বা যৌগিক যা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। উসূল (أصول) এবং আল-ফিক্‌হ (الفقه)। তাই উসূলুল ফিক্‌হ-এর সঠিক পরিচয় জানতে হলে প্রথমে এ দুটি শব্দের সংজ্ঞা জানা আবশ্যক।

উসূল (أصول) শব্দটি আসল (أصل) শব্দের বহুবচন। শাব্দিক অর্থ মূল বা ভিত্তি; অর্থাৎ যে বস্তুর ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়, তাকে আসল বলে। পারিভাষিকভাবে আসল (أصل) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। যথা—

১. **الدليل** (আদ্-দালীল) বা দলীল এবং প্রমাণ অর্থে, যেমন : বলা হয়, أصل هذه المسألة الكتاب অর্থাৎ এই মাস'য়ালার দলীল হলো আল-কুরআন। এখানে আসল শব্দটি দলীল বা উৎস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. **القاعدة** (আল-কা'য়িদা) বা মূলনীতি অর্থে, যেমন : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل অর্থাৎ অতীব প্রয়োজনে নিরুপায় অবস্থায় মৃত বস্তুর বৈধতা সাধারণ মূলনীতির পরিপন্থি। এখানে আসল শব্দটি কা'য়িদা বা মূলনীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. **الراجح** (আর-রাজিহ) বা প্রাধান্য অর্থে, যেমন : الأصل في الكلام الحقيقة অর্থাৎ কথায় মূলবক্তব্যই প্রাধান্য রূপকার্থ নয়। এখানে আসল শব্দটি রাজিহ বা প্রাধান্য অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৪. **الاستصحاب** (আল-ইস্তিসহাব) বা কোনো বিষয়ে তার পূর্বের বিধানের কার্যকারিতা বহাল রাখা অর্থে, যেমন : الأصل بقاء ما كان على ما كان অর্থাৎ পূর্বে যা যে অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, সে অবস্থায় বহাল থাকবে

যতক্ষণ না তাতে পরিবর্তন সাধনের কোনো গ্রহণযোগ্য দলীল পাওয়া যাবে। আসল শব্দটি এখানে ইস্তিসহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

ফিক্হ (الفقه) শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞার্থ হলো : গভীরভাবে কিছু জানা, বুঝা, উপলব্ধি করা, অনুধাবন করা, সূক্ষ্মদর্শিতা, জ্ঞাত হওয়া, অবগত হওয়া ইত্যাদি।[২]

পরিভাষায় আল-ফিক্হ এমন শাস্ত্র, যার মাধ্যমে ইসলামী শরী'য়তের উৎসসমূহের বিশদ প্রমাণাদি থেকে অর্জিত দৈনন্দিন জীবনের সকল 'আমলী বা ব্যবহারিক বিষয়ে ইসলামী শরী'য়াতের বিধানাবলি জানা যায়।[৩]

আল্লামা তাকী উদ্দীন আস-সুবকী (রাহ.) [৬৮৩-৭৫৬ হি.]-এর মতে, শরী'য়াতের বিস্তারিত দলীল থেকে শর'য়ী হুকুম তথা ব্যবহারিক বিধিবিধান উদ্ভাবন করার প্রক্রিয়াসংক্রান্ত জ্ঞান।[৪] আর এ জ্ঞানপ্রসূত শরী'য়াতের বিধিবিধানগুলো যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাকে ফিক্হ শাস্ত্র বা ইলমূল ফিক্হ তথা ইসলামী আইনশাস্ত্র বলা হয়। ফিক্হ শব্দটি এই অর্থেই প্রসিদ্ধ। তবে বাংলা ভাষায় এটিকে ফিকাহ, ফিক্হ শাস্ত্র, ফেকাহ, ফেকাহ শাস্ত্রও বলা হয়।[৫]

---

১. আল-ফাইয়ূমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মদ, ***আল-মিসবাহুল মুনির*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ১ পৃ. ১৩১; আল-জুরজানী, আলী ইবন মুহাম্মদ, ***আত-তা'রীফাত*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ২৮; আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*** (বৈরূত : মুয়াস্সাতুর রাইয়্যান ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১১।

২. ইবনু মানযূর, মুহাম্মদ ইবনু মোকার্রাম আল-আফরিকী, ***লিসানুল 'আরাব*** (বৈরূত : দারু সাদির, ৪র্থ প্র. ২০০৪ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৫২২; মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ অনূদিত আল-হিদায়ার ভূমিকা; ***ফিকাহ শাস্ত্রের কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য*** (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯৮ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৭; আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১৮।

৩. আল-আমেদী, সাইফুদ্দীন আলী, ***আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম***, (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৬; আস-সুবকী, তাকী উদ্দীন, ***আল-ইবহাজ ফী শারহিল মিনহাজ***, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৮; আয-যারকাশী, বাদরুদ্দীন, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ*** (বৈরূত : দারুল কুতুবী, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫।

৪. আস-সুবকী, ***আল-ইবহাজ ফী শারহিল মিনহাজ***, খ. ১, পৃ. ২৮।

৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮; আব্দুর রহীম স্যার, ***ইসলামী আইনতত্ত্ব***, গাজী শামছুর রহমান অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১-৬।

উসূলুল ফিক্হ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

উসূলুল ফিক্হ এমন কতগুলো মূলনীতি এবং প্রতিপাদ্যের সমষ্টি যেগুলোর মাধ্যমে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরী'য়াতের ব্যবহারিক বিধান উদ্ঘাটন করা যায়।

«الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ».[৬]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহ.) [৫৪৪-৬০৬ হি.]-এর মতে, উসূলুল ফিক্হ হচ্ছে ফিক্হশাস্ত্রের সামগ্রিক দলীল-প্রমাণের সমষ্টি, এর অবস্থা এবং তা শাখাপ্রশাখায় প্রয়োগ ও প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার নাম।

«مجموع طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد»[৭]

কারও কারও মতে, উসূলুল ফিক্হ হচ্ছে, এমন কতগুলো মূলনীতি জানার নাম, যেগুলো ফিক্হশাস্ত্রের বিধানসমূহ দলীল-প্রমাণের দ্বারা উদ্ঘাটন করতে সাহায্য করে।[৮]

আধুনিক উসূলবিদ ড. আব্দুল করীম আন-নামলাহ্ এর মতে, উসূলুল ফিকহের অনেকগুলো সংজ্ঞার নির্যাস হচ্ছে;

«هو: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد»

উসূলুল ফিক্হ হচ্ছে, সার্বিকভাবে ফিক্হের দলীলসমূহ জানা ও কীভাবে এগুলো প্রয়োগ করা যায় এবং উপকৃতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।[৯]

---

৬. আল-জুওয়াইনী, ইমামুল হারামাইন, ***আল বুরহান ফী উসূলিল ফিক্হ*** (মিসর : দারুল ওয়াফা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৮ হি.) খ. ২, পৃ. ৮৫৫; আস-সুবকী, ***আল-ইবহাজ***, খ. ১, পৃ. ১৭; আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১৩।

৭. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, ***আল-মাহসূল*** (বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭ খ্রি. তাহকীক : ড. ত্বাহা জাবের আল-আলওয়ানী), খ. ১, পৃ. ৮০।

৮. আল-আলওয়ানী, তাহা জাবির, ***ইসলামী উসূলে ফিকাহ*** (আল-মা'হাদুল ইসলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯।

৯. আন-নাম্লাহ, আব্দুল করীম ইবনু আলী, ***আল-মুহায্যাব ফী উসূলিল ফিক্হিল মুকারন*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭; আল-আল্ওয়ানী, ত্বহা জাবির, ***ইসলামী উসূলে ফিকাহ*** (আল-মা'হাদুল ইসলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ. ৯।

উসূলুল ফিক্হ-এর উপনামসমূহ

ইসলামী আইন শাস্ত্রের ভিত্তি, ইসলামী ফিক্হশাস্ত্রের উৎসগত পদ্ধতিবিদ্যা, ইসলামী আইনের মূলনীতি, ফিক্হশাস্ত্রের মূলনীতি, ইসলামী আইনের উৎস, ইসলামী আইনতত্ত্ব প্রভৃতি।

উসূলুল ফিক্হ-এর বিষয়বস্তু

ইসলামী শরী'য়াতের মৌলিক ও সম্পূরক দলীলসমূহ ও এর প্রকার, স্তর এবং কীভাবে ওই সকল দলীলের ভিত্তিতে যথাযথ শর'য়ী বিধিবিধান সাব্যস্ত করা যায়। দলীল-প্রমাণ বর্ণনায় পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকলে কীভাবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বক্তব্য নির্বাচন করা যায়।[১০]

'উসূলুল ফিক্হ' অধ্যয়নের উপকারিতা

উসূলুল ফিক্হ অধ্যয়নের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

১. দলীল-প্রমাণাদির স্বরূপ, ধরন ও প্রামাণিকতা এবং এর ভিত্তিতে বিধিবিধান আহরণের পদ্ধতি জানা।

২. ফিক্হের বিধিবিধান সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হওয়া।

৩. ইমামদের মতামত থেকে কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য তা নির্বাচন করতে সক্ষম হওয়া।

৪. আইনি পাঠ্যগুলির সঠিক ব্যাখ্যা এবং নতুন উদ্ভূত নানা বিষয়ের নিষ্পত্তি করণের যোগ্যতা অর্জন ইত্যাদি।[১১]

'উসূলুল ফিক্হ' ও 'কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ'-এর মধ্যে পার্থক্য

'কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ' হচ্ছে ফিক্হশাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান[১২]।'কাওয়া'য়িদ' কা'য়িদাহ শব্দের বহুবচন, কা'য়িদাহ অর্থ নিয়ম,

[১০] অধ্যাপকবৃন্দ, শরীয়াহ ও আইন অনুষদ, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, ***মুজাকারাতু উসূলিল ফিক্হ*** (মিসর : ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ২২; আন-নাম্লাহ, ***আল-মুহায্যাব ফী উসূলিল ফিক্হিল মুকারান***, খ. ১, পৃ. ৩৮; আল-আল্ওয়ানী, ত্বহা জাবির, ***ইসলামী উসূলে ফিকাহ***, পৃ. ৯।

[১১] আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*** (দামিশ্ক : দারুল খাইর, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪।

[১২] কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ এর গুরুত্ব ও উপকারিতা অপরিসীম, যা একজন ফিকহের ছাত্রের জানা থাকা খুবই প্রয়োজন; এ সম্পর্কে আল্লামা শিহাবুদ্দীন আল-কারাফী (রাহ.) [মৃ. ৬৮৪ হি.] বলেন, এই কা'য়িদাহসমূহ ফিক্হশাস্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনেক উপকারী। একজন ফকীহ এগুলো যত বেশি আয়ত্ত করতে পারবেন, তাঁর সম্মান ও মর্যাদা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে, তাঁর ফিক্হের সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে। এগুলোর মাধ্যমে তিনি ফিক্হী-সমাধান প্রদানের পদ্ধতি ও

নীতি, সূত্র, বচন ইত্যাদি। ফিক্হী কা'য়িদা বলতে বোঝানো হয়, এমন একটি ব্যাপ্তিশীল সূত্রিত ফিক্হী বিধান, যা তার অন্তর্গত শাখাসমূহ কিংবা অধিকাংশ শাখার ওপর প্রযোজ্য হয় এবং একটি সামগ্রিক নীতি বা আইনী সূত্রে পরিনত হয়। এর সাহায্যে অসংখ্য শাখা-বিষয়ের বিধান জানা যায়। যেমন : الضرر يزال—অর্থাৎ ক্ষতি অপসারণ করা হবে। এটি ফিকহের একটি সামগ্রিক কা'য়িদা বা মূলনীতি, যা মূলত সুত্রিত একটি সামগ্রিক বিধান। এর মাধ্যমে এর ওপর ভিত্তি করে ফিকহের অসংখ্য শাখা-বিধান প্রণীত হয়েছে।[১৩]

উসূলুল ফিক্হ ও কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র শাস্ত্র হলেও উভয়ের মাঝে একটা বিষয়ে মিল রয়েছে, তা হলো উভয়টি ব্যাপ্তিশীল মূলনীতি যার অধীনে অনেকগুলি (فروع) শাখা-প্রশাখা বা ব্যবহারিক উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে অনেকে মনে করেন, উভয়টি একই শাস্ত্রের দুই নাম। তবে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্নভাবে পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলো[১৪] বর্ণনা করা হলো—

১. উসূলুল ফিক্হ হচ্ছে বিধানের উৎস ও দলীল। আর কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ হচ্ছে হুকুম বা বিধান।

কৌশল রপ্ত করতে পারবেন। পক্ষান্তরে যিনি এ কাওয়া'য়িদ আয়ত্ত ছাড়া বিভিন্ন শাখা-বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিধান বের করে সমাধান করতে চেষ্টা করবেন, তাঁর কাছে অনেক শাখাপ্রশাখা পরস্পর সাংঘর্ষিক ও অমিল মনে হবে এবং এর মাধ্যমে তাঁর অন্তর উদ্বিগ্ন ও অশান্ত হয়ে পড়তে পারে, ফলে তিনি নিজেকে সংকুচিত করে হতাশও হয়ে যেতে পারেন। উপরন্তু, তাঁকে এত অগনিত শাখাপ্রশাখা (মাস'য়ালা) মুখস্থ করতে হবে যে, হয়তো তাঁর আয়ু শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু সব মাস'য়ালা মুখস্থ করা সম্ভব হবে না। পরন্তু, যিনি ফিক্হশাস্ত্রকে এর কা'য়িদাগুলোসহ আয়ত্ত করতে পারবেন, তাঁকে এত বেশি সংখ্যক মাস'য়ালা মুখস্থ করতে হবে না। কেননা এগুলোর অধিকাংশই বড় কা'য়িদাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও অন্যের কাছে যে শাখাগুলো পারস্পরিক সাংঘর্ষিক ও অমিল, তাঁর কাছে সেগুলো সূত্রিত ও সংগত মনে হবে। (আল-কারাফী, শাহাবুদ্দীন, ***আল-ফুরূক 'আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়ায়িল ফুরূক*** (বৈরূত : 'আলামুল কুতুব, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৩।)

[১৩] আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, ***আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ির*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.) পৃ. ৭।

[১৪] আন-নাম্লাহ, আব্দুল করীম ইবনু আলী, ***আল-জামি' লি-মাসায়িলি উসূলিল ফিক্হ ওয়া তাতবিক্বাতুহু আ'লা-ল মাযাহিবির রাজিহ*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১২; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-কাওয়া'য়িদিল ফিক্হিয়্যাহ ওয়া তাতবিক্বাতুহু আ'লাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*** (দামিশ্ক : দারুল ফিক্র, ২০০৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৩।

২. উসূলুল ফিক্হ সামগ্রিক ও সকল শাখায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ হচ্ছে ব্যাপ্তিশীল অধিকাংশ শাখার জন্য প্রযোজ্য; তবে সামগ্রিক নয়।

৩. উসূলুল ফিক্হ-এর উদ্দেশ্য শর'য়ী বিধান নির্গত করা বা ইসতিম্বাত করা। আর কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ-এর উদ্দেশ্য সূত্রকরণ অর্থাৎ তার অন্তর্গত শাখাসমূহকে একসূত্রে গাঁথা।

৪. উসূলুল ফিক্হ-এর উৎস হচ্ছে যথাক্রমে; কুরআন, সুন্নাহ, ধর্মতত্ত্ব, আরবী ভাষা। আর কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ-এর উৎস কখনো কুরআন, কখনো সুন্নাহ, কখনো ইজমা' কিংবা কিয়াস, প্রথা ইত্যাদি হয়ে থাকে।

৫. কাল্পনিক ও বাস্তব আগমনের দিক দিয়ে উসূলুল ফিক্হ-এর আগমন আগে ঘটেছে। কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ অনেক পরে এসেছে।

৬. উসূলুল ফিক্হ-এর স্বরূপ হচ্ছে মূল। আর কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ-এর স্বরূপ হচ্ছে শাখা।

শর'য়ী বিধান বা আল-হুক্ম আশ-শর'য়ী (الحكم الشرعي)

শর'য়ী বিধান-এর পরিচয়

শর'য়ী বিধান বা আল-হুক্ম আশ-শর'য়ী বলতে বোঝানো হয়, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে 'মুকাল্লাফ' (مكلّف) বা সুস্থ, বুদ্ধিসম্পন্ন ও শরী'য়াতের বিধান প্রয়োগযোগ্য সাবালক বান্দার প্রতি এমন কোনো বার্তা, যা আদেশ কিংবা নিষেধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। চাই সেটা বাধ্যতামূলক হোক, কিংবা বাধ্যতামূলক না হোক, অথবা স্বেচ্ছাধীন; করা বা না করার অনুমোদনযোগ্য হোক। অথবা অন্য জিনিসের কারণ, শর্ত, প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় হিসাবে হোক।[১৫] বাংলা ভাষায় এটিকে হুকুম, হুক্মে শর'য়ী, শর'য়ী বিধিবিধান, ইসলামী বিধানও বলা যায়।

শর'য়ী বিধান বা আল-হুক্ম আশ-শর'য়ী-এর প্রকারভেদ

আল-হুক্ম আশ-শর'য়ী দুই প্রকার[১৬]–

ক. আল-হুক্ম আত-তাক্লীফী (الحكم التكليفي) দায়িত্বমূলকবিধান

খ. আল-হুক্ম আল-ওয়াদ্ব'ঈ (الحكم الوضعي) প্রতীক-বিধান

ক) আল-হুক্ম আত-তাক্লীফী (الحكم التكليفي)-এর পরিচয়

আল-হুক্ম আত-তাক্লীফী বা দায়িত্বমূলক বিধান হচ্ছে : আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে 'মুকাল্লাফ' (مكلّف) বান্দার কাছে কোনো কাজ করা কিংবা বর্জন করার আদেশ; যা বাধ্যতামূলক কিংবা বাধ্যতামূলক ছাড়া হয়ে থাকে। অথবা কোনো কাজ করা বা না করার স্বাধীনতা ও অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। আল-হুক্ম আল-তাকলীফীর এই সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় যে তা পাঁচ প্রকার।[১৭]

---

[১৫] আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, ***আল-মাহসূল***, খ. ১, পৃ. ৮৯; খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ*** (মিসর : মাতবায়াতুল মাদানী, তা. বি.), পৃ-৯৪।

[১৬] খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***; আন-নাম্লাহ, ***আল-মুহাযযাব ফী উসূলিল ফিক্হ আল মুকারন***, খ. ১, পৃ. ১৩০-১৩৩।

[১৭] আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১৮ ।

আল-হুক্ম আত-তাক্লীফী-এর প্রকারভেদ

এক. ওয়াজিব (الواجب) আবশ্যকীয়

ওয়াজিব-এর পরিচয়

ওয়াজিব-এর আভিধানিক অর্থ : ওয়াজিব (واجب) একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ : পতিত হওয়া, বিচ্যুত হওয়া, সাব্যস্ত হওয়া, আবশ্যকীয় তথা; الساقط، الثابت، اللازم (আস-সাক্বিতু, আস-সাবিতু, আল-লাজিমু)। যেমন–

- যখন কোনোকিছু পতিত হয় তখন বলা হয় وَجَبَ ।
- বলা হয়ে থাকে, وَجَبَ الحَائِطُ—যখন দেয়াল পড়ে যায়।
- বলা হয়, وَجَبَ البَيْعُ وُجُوْبا إذا ثَبَتَ ولَزِمَ—যখন ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে নিশ্চিত হয়ে যায়।
- বলা হয়, أوجبه الله—যখন কোনোকিছু আল্লাহ্ তা'আলা আবশ্যিকভাবে ধার্য করেন।[১৮]

ওয়াজিব-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ

ওয়াজিব হলো যা শরী'য়াত প্রণেতা মুকাল্লাফ বান্দার কাছ থেকে আবশ্যিকভাবে দাবি করেন। যা বাস্তবায়ন করলে তার জন্য সাওয়াব এবং পুরস্কার রয়েছে। আবার ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করলে তার জন্য গুনাহ এবং শাস্তি রয়েছে।[১৯]

ফরয ও ওয়াজিব-এর মধ্যে পার্থক্য

অধিকাংশ ইমামদের মতে, ওয়াজিব ও ফরয এক ও সমার্থবোধক। ফরয যেটি ওয়াজিবও সেটি এবং উভয়টি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক নির্দেশ ও অবশ্যই করণীয়। এ দুটি পরিভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং তাঁরা একটির স্থলে অপরটি ব্যবহার করে থাকেন। তবে

---

১৮. আল-আযহারী, মুহাম্মদ ইবন আহমদ, ***তাহযীবুল লুগাহ*** (বৈরূত : দারু ইহ্য়াউত তুরাস, ২০০১ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ১৫১; আর-রাযী, যাইনুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর, ***মুখতারুস সিহাহ*** (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ৫ম প্র., ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৩৩; ইবনু মানযূর, ***লিসানুল 'আরাব***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৯৩।

১৯. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১০৭; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৩০৫।

হানাফী ইমামগণ ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল [১৬৪-২৪১ হি.] এক বর্ণনা মতে, ফরয ও ওয়াজিব অবশ্যই করণীয় হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।[২০] ওপরের ওয়াজিবের সংজ্ঞার দিক দিয়ে নয়, বরং ফরয কিংবা ওয়াজিব-এর প্রমাণগুলোর সাব্যস্ত হওয়ার পদ্ধতি এবং তা কতটুকু প্রামাণ্য তার দিক থেকে। কুরআন কিংবা সুন্নাহর সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সন্দেহাতীত 'দলীলে কাত'ঈ বা সুনির্দিষ্ট অকাট্য প্রমাণ দ্বারা কোনো আদেশ দেওয়া হলে তা হবে সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত বাধ্যতামূলক এবং ফরয। কুরআন ও সুন্নাহ মুতাওয়াতির-এর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য থেকে এমন বিধান সাব্যস্ত হয়। যেমন : সালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন বা সুন্নাহ থেকে কোনো আদেশ যদি 'দলীলে যান্নী' বা প্রবল ধারণাভিত্তিক প্রমাণ—যেমন : একাধিক হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার মতো সম্ভাবনাময় কুরআনের আয়াত কিংবা আহাদ হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়—তা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বাধ্যতামূলক কাজ এবং ওয়াজিব। এগুলোও অবশ্যই পালন করতে হয়। কিন্তু ফরযের মতো বাধ্যতামূলক নয়। যেমন : ঈদের সালাত, বিতরের সালাত, সাদকাতুল ফিতর, কুরবানী। কেউ ফরয অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফির হবে না, বরং ফাসিক হবে।[২১]

আবার কারো কারো মতে, ফরয হচ্ছে যেটা ফরয হওয়ার ব্যাপারে কারোই দ্বিমত নেই, পক্ষান্তরে ওয়াজিব হচ্ছে, যেটা ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।[২২]

শাফি'য়ী মাযহাবে হজ্জের বেলায় ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য আছে, যেমন : ওয়াজিব হচ্ছে যা ছুটে গেলে 'দম' বা পশু জবাই-এর মাধ্যমে শুধরানো যায়, আর ফরয হচ্ছে যা দমের মাধ্যমে শুধরানো যায় না। তেমনইভাবে সালাতে ওয়াজিব ভুলে বাদ পড়ে গেলে 'সাজদাহ সাহু'-এর মাধ্যমে শুধরানো সম্ভব, কিন্তু ভুলে কোনো রুকন বা ফরয বাদ গেলে কোনোভাবেই শুধরানো সম্ভব নয়।[২৩]

---

২০. কাযী আবু 'ইয়ালা, মুহাম্মদ ইবনুল হোসাইন, ***আল-'উদ্দা ফী উসূলিল ফিক্হ*** (রিয়াদ : ১৪১০ হি.- ১৯৯০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৭৬; আল-হাম্বলী, ইবনু রজব, ***জামি'উল উলূমি ওয়াল হিকাম*** (বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ৭ম প্র, ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৫৩; আল-হানাফী, আমীর-বাদশাহ, ***তাইসিরুত তাহরীর*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২২৯।

২১. আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ২৩।

২২. আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ***, খ. ১, পৃ. ২৪৩।

২৩. প্রাগুক্ত।

আরেকটি দুর্বল মত অনুযায়ী ফরয হচ্ছে : যেটা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। আর ওয়াজিব হচ্ছে; যেটা সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত।[২৪]

ওয়াজিব চিহ্নিত হওয়ার সীগাহ বা শব্দসমূহ

যে পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে ওয়াজিব চিহ্নিত হবে। কুরআন-সুন্নাহতে এরকম অনেক উপায় রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।[২৫]

১. আদেশসূচক শব্দসমূহ, صيغة الأمر بلفظ الإنشاء (সিগাতুল আমরি বি-লাফযিল ইন্‌শায়ি) এগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন–

(ক) আদেশসূচক ক্রিয়া فعل الأمر (ফি'লুল আম্‌র)। যথা—মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

'তোমরা সালাত কায়েম করো।[২৬] এখানে أقيموا কায়েম করো এটা ফি'লুল আম্‌র বা আদেশমূলক ক্রিয়া, এর মাধ্যমে ওয়াজিব তথা ফরয সাব্যস্ত হবে।'

(খ) আদেশজ্ঞাপক লামযুক্ত মুদারি' বা বর্তমান ও ভবিষ্যতজ্ঞাপক ক্রিয়া। المضارع المجزوم بلام الأمر (আল-মুযারে' আল-মাজযুম বিলামি-ল আমর) যথা- মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

'তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।'[২৭]

(গ) আদেশসূচক ক্রিয়াবিশেষ্য اسم فعل الأمر (ইসমু ফি'লি আম্‌র) যথা—মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

২৪. আল-হাম্বলী, ইবনু রজব, *জামি'উল উলূমি ওয়াল হিকাম*, খ. ২, পৃ. ১৫৩।
২৫. আন-নাম্‌লাহ, আব্দুল করীম ইবনু আলী, *আল-মুহাযযাব ফী উসূলিল ফিক্‌হিল মুকারন*, খ. ১, পৃ. ১৫৫।
২৬. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ৪৩।
২৭. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আল-নিসা) : ৯।

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ ভ্রান্ত পথে গেলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।'[২৮]

(ঘ) আদেশসূচক ক্রিয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত মাসদার বা ক্রিয়ামূল المصدر النائب عن فعل الأمر (আল-মাসদার আন-নায়েব আন ফি'লি আম্‌র) যথা—মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾

'তাদের গর্দানগুলোতে আঘাত করো।'[২৯]

২. 'আমর' أمر শব্দ এবং এর থেকে রূপান্তরিত অন্যান্য শব্দসমূহ। صيغة أمر وما يتصرف عنها (সিগাতু আমর ওয়ামা ইয়াতাসার-রাফু 'আনহা) যেমন : মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾

'আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন।'[৩০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة»

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছি যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে করেছেন। সেগুলো হলো, শ্রবণ করা, অনুসরণ করা, জিহাদ করা, হিজরত করা এবং দলবদ্ধভাবে থাকা।'[৩১]

৩. কুরআন ও সুন্নাহয় كُتِبَ، كَتَبَ শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যবহৃত সিগাহ এবং এর অর্থ প্রদানকারী অন্য শব্দ। صيغة كَتَبَ و كُتِبَ (সিগাতু কাতাবা ওয়া কুতিবা)। উদাহরণ—মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

২৮. আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়েদা) : ১০৫।
২৯. আল-কুরআন, ৪৭ (সূরা মুহাম্মদ) : ৪।
৩০. আল-কুরআন, ১৬ (সূরা আন-নাহল) : ৯০।
৩১. আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *সুনান আত-তিরমিযী "আল-জামি'উল কবীর"* (মিসর : মাকতাবাতু মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় প্র, ১৯৭৫ খ্রি.), হাদীস নং ২৮৬৩, খ. ৫, পৃ. ১৪৮।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সাওম ফরয ওরা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।'[৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর ওপর ইহসান করাকে ফরয করেছেন। যখন তোমরা কাউকে (ন্যায়সংগত কারণে) হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে করো। যখন তোমরা পশু জবেহ করবে তখন সুন্দরভাবে জবেহ করবে এবং জবেহ করার সময় অস্ত্রকে ধারালো করে নেবে।'[৩৩]

৪. ফরয শব্দ فرض **এবং** এর থেকে রূপান্তরিত অন্যান্য সীগাহ। صيغة فرض وما يتصرف عنها (সিগাতু ফারাদা ওয়ামা ইয়াতাসার-রাফু আনহা) যেমন: মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾

'এটি একটি সূরা, এটি আমরা নাযিল করেছি এবং এর বিধানকে আমরা অবশ্য পালনীয় করেছি।'[৩৪]

উক্ত আয়াতে فرض **শব্দটি** ওয়াজিব হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. যেসব কাজ না করলে কুরআন কিংবা সুন্নাহর ভাষ্যে শাস্তি কিংবা তিরস্কারের ব্যবস্থার কথা আছে, সেসব কাজ করা ওয়াজিব। যেমন: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

---

[৩২] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা): ১৮৩।

[৩৩] ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ, ***সহীহ মুসলিম*** (বৈরূত: দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.), হাদীস নং ১৯৯৫, খ. ৩, পৃ. ১৫৪৮।

[৩৪] আল-কুরআন, ২৪ (সূরা আন্-নূর): ১।

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

'অতঃপর তোমরা যদি সুদ পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।'[৩৫]

৬. এ ছাড়াও আরবদের ভাষায় আরও কিছু পদ্ধতি আছে যেগুলো ওয়াজিবের অর্থ বুঝায়। যেমন: "له عليك فعل كذا" (লাহু 'আলাইকা ফি'লু কাযা)। উদাহরণ: মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

'আর এ ঘরের হজ্জ করা মানুষের ওপর আল্লাহ্র ফরয, যাদের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার।'[৩৬]

ওয়াজিব-এর উপনামসমূহ (ألقاب)

ওয়াজিব/ফরয বোঝানোর জন্য আরও কিছু পরিভাষা ব্যবহার হয়ে থাকে;

১. ফরয/ফরিযাহ- فرض (অবশ্যকর্তব্য)

২. মাহতূম- محتوم (অনিবার্য)

৩. মাকতূব- مكتوب (নির্ধারিত)

৪. লাযিম- لازم (আবশ্যক)[৩৭]

ওয়াজিব-এর প্রকারভেদ

ওয়াজিবকে বিভিন্ন দিক থেকে ভাগ করা যায়।[৩৮] যথা—

প্রথমত, আদায় করার সময়ের দিক থেকে ওয়াজিব দুই প্রকার—

---

[৩৫] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা): ২৭৯।

[৩৬] আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে-ইমরান): ৯৭।

[৩৭] আল- হিন্দী, সফিউদ্দীন মুহাম্মদ, ***নিহায়াতুল ওসূল ফী দিরায়াতিল উসূল*** (মক্কা: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫১৬; আল-মিনয়াবী, মাহমূদ ইবন মুহাম্মদ, ***আশ-শারহুল কবীর লি মুখতাসারিল উসূল মিন 'ইলমিল উসূল*** (মিসর: আল-মাকতাবাতুশ্ শামিলাহ, ১ম প্র.-২০০১ খ্রি.), পৃ. ১০৪।,

[৩৮] আবু যাহরাহ, ***উসূলুল ফিক্হ*** (কায়রো: দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ৩০; আল-জুদাই', ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ২৩; আন-নামলাহ, আব্দুল করীম ইবন আলী, ***আল-মুহাযযাব ফী উসূলিল ফিক্হিল মুকারন***, খ. ১, পৃ. ১৪৮; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজিয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৩০৯।

(ক) উন্মুক্ত ওয়াজিব واجب مطلق (ওয়াজিবুন মুতলাকুন) এটা হলো এমন ওয়াজিব যেটা আদায় করার জন্য শরী'য়াত কোনো সময় নির্ধারিত করে দেয়নি।

যেমন : রমাদ্বানের কাযা সাওম, কেউ রমাদ্বান মাসে শর'য়ী ওযরের কারণে সাওম রাখতে পারেনি। এই কাযা সাওম পূরণ করা ওয়াজিব। এর জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, বরং রমাদ্বান মাসের পর ওই বছরের যেকোনো সময় বান্দা এ কাযা সাওম আদায় করতে পারবেন। তার জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা আবশ্যক নয়। পরে সম্পন্ন করলেও কোনো গুনাহ হবে না।

(খ) শর্তযুক্ত ওয়াজিব واجب مقيد (ওয়াজিবুন মুক্বাইয়াদুন)। এটা এমন ধরনের ওয়াজিব যেটা আদায় করার জন্য শরী'য়াত প্রণেতা একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে আদায় করলে সেটা আদায় হবে না। যেমন : রমাদ্বান মাসের সাওম রাখা, শর'য়ী ওযর বা অপারগতা ব্যতীত যে ব্যক্তি রমাদ্বান মাস পেল তার জন্য সেটা পরে আদায় করার কোনো সুযোগ নেই, তাকে এই নির্ধারিত এক মাস সময়েই আদায় করতে হবে। যেমন : মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

'তোমাদের মধ্যে যে রমাদ্বান মাস পেল সে যেন সাওম রাখে।'[৩৯] আর এই কারণে সে নির্ধারিত সময়ে সাওম রাখা ব্যতীত সে তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে না।

দ্বিতীয়ত, পরিমাণ এবং সীমানা নির্ধারণের দিক থেকে ওয়াজিব দুই প্রকার। যথা—

(ক) নির্ধারিত ওয়াজিব واجب محدد (ওয়াজিবুন মুহাদ্দাদুন) এটা এমন ধরনের ওয়াজিব যেটার পরিমাণ শরী'য়াত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। শরী'য়াত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ আদায় করা বান্দার জন্য আবশ্যক। যেমন : শরী'য়াত যাকাতের খাতসমূহ এবং পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

আর এ প্রকারের হুকুম হলো শরী'য়াত যে পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে পরিমাণ আদায় করা বান্দার জন্য আবশ্যক। শরী'য়াত কর্তৃক নির্ধারিত

৩৯. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৮৫।

পরিমাণ আদায় করা ব্যতীত বান্দা তার দায় থেকে মুক্ত হবে না। যেমন : যাকাতের নেসাব এবং ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ।

(খ) অনির্ধারিত ওয়াজিব واجب غير محدد (ওয়াজিবুন গাইরু মুহাদ্দাদিন) এটা এমন ধরনের ওয়াজিব যেটার কোনো সীমানা শরী'য়াত নির্ধারিত করে দেননি।

উদাহরণ—স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়া স্বামীর ওপর শরী'য়াত ওয়াজিব করেছেন। কিন্তু ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি। তেমনইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সৎকাজের সহযোগিতা করার জন্য আদেশ করেছেন। কিন্তু সেটার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি। অবস্থা, সামর্থ্য ও প্রথার ওপর নির্ভর করবে।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত বাধ্যবাধকতার দিক থেকে ওয়াজিব দুই প্রকার। যথা—

(ক) ওয়াজিব 'আইনি বা ফরযে 'আইন واجب عيني (ওয়াজিবুন 'আইনিয়্যুন)। এটা এমন ওয়াজিব যা শরী'য়াত প্রত্যেক উপযুক্ত ও যোগ্য বান্দার ওপর ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং কিছু লোকের আদায়ের মাধ্যমে অন্যরা দায়িত্বমুক্ত হবে না। প্রত্যেককে নিজ নিজ পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। উদাহরণ—পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমাদ্বানের সাওম রাখা ইত্যাদি।

(খ) ওয়াজিব কিফায়ী অথবা ফরযে কিফায়াহ واجب كفائي (ওয়াজিবুন কিফাইয়্যুন) এটা এমন ওয়াজিব যেটা শরী'য়াত প্রণেতা যোগ্য ব্যক্তিদের সমষ্টির ওপর বাধ্যতামূলক করেছেন। তবে কিছু লোকের আদায়ের মাধ্যমে বাকিরা দায়িত্ব মুক্ত হবেন। অন্যথায় সকলে গুনাহগার হবেন। এর উদাহরণ—জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ করা, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা ইত্যাদি সমাজের সামষ্টিক বা সম্মিলিত কর্তব্য ফরযে কিফায়াহ।

বলাবাহুল্য, এই কাজগুলো সমাজের কতিপয় ব্যক্তি পালন করলে সমগ্র সমাজের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায় অর্থাৎ যারা পালন করতে পারেনি তাদের ফরয আদায় না করার গুনাহ হবে না। তবে প্রকৃতপক্ষে কেবল যারা এই কিফায়ী কাজে কর্তব্য পালন করেছেন তারাই কেবল সাওয়াব অর্জন করবেন। আবার অনেক সময় ফরযে কিফায়াহ ফরযে আইনে পরিবর্তিত

হয়ে যায়। যেমন : কোনো শহরে যদি কেবলমাত্র একজন যোগ্য আলেম থাকেন তখন মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা তার জন্য ফরযে আইন হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কোনো ফরযে কিফায়াহ কাজ শুরু করার পর ফরযে আইন হয়ে যায়।[৪০]

চতুর্থত, সময়ের বিবেচনায় ওয়াজিব দুই প্রকার—

(ক) পূর্ণসময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ওয়াজিব واجب مضيق (ওয়াজিবুন মুদ্বাইয়াকুন) এমন এক ধরনের সুনির্দিষ্ট ওয়াজিব যেখানে বান্দার উক্ত ওয়াজিব পালন করা ছাড়া একই ধরনের অন্য ওয়াজিব আদায় করার ইখতিয়ার থাকে না। এটাকে অনেকে ওয়াজিব মু'আইয়্যান বলেছেন।

উদাহরণ—রমাদ্বান মাসের সাওম রাখা, এখানে রমাদ্বান মাসে রমাদ্বানের সাওম ব্যতীত অন্য কোনো সাওম আদায় করার এখতিয়ার বান্দার নেই।

(খ) কিছুসময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ওয়াজিব واجب موسع (ওয়াজিবুন মুওয়াসসা'উন) এটা এমন ধরনের ওয়াজিব যেখানে বান্দার ওই ওয়াজিব পালন করা ব্যতীত ওই সময়ে একই জাতীয় ও অন্য জাতীয় ওয়াজিব পালন করার এখতিয়ার আছে।

উদাহরণ—সালাতের সময়। সেখানে একটি ফরয সালাত আদায় করা ছাড়াও একই ধরনের অন্য ইবাদত করার সুযোগ রয়েছে।

পঞ্চমত, সুনির্দিষ্ট এক বা একাধিক সুযোগ থাকার বিবেচনায় ওয়াজিব দুই প্রকার। যথা–

(ক) নির্দিষ্ট একক কর্মসংক্রান্ত ওয়াজিব واجب معين (ওয়াজিবুন মু'আইয়্যানুন) যখন কোনো একটি ফরয বা ওয়াজিব আদায়ের ব্যাপারে শরী'য়াত কোনো বিকল্প দেয়নি। তখন সেটা একক ওয়াজিব হিসাবে বিবেচিত হয়। এটাকে অনেকে ওয়াজিব মুদ্বাইয়াক বলেছেন।

যেমন : কারও ফরয সালাত ছুটে গেলে তাকে সেই ফরয সালাত আদায় করতে হবে, অন্য কিছু নয়।

৪০. আল-আনসারী, যাকারিয়া ইবনু মুহাম্মাদ, *গা-য়াতুল উসূল ফী লুব্বিল উসূল* (মিসর : দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, তা. বি.), পৃ. ২৯; আত-তূফী, সুলাইমান, ***শারহু মুখতাসারির রাউদাহ*** (বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্র, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪১০।

(খ) একাধিক সুযোগ সম্বলিত ওয়াজিব واجب غير معين (ওয়াজিবুন গাইরু মু'আইয়্যানুন) যখন শরী'য়াত কোনো ওয়াজিব পালনের ব্যাপারে একাধিক সুযোগ প্রদান করে এবং তা থেকে যেকোনোটি গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করে থাকে। এটাকে অনেকে ওয়াজিবুন মুওয়াসসা'উন বলেছেন।

উদাহরণ—কসমের কাফ্‌ফারা, এটা ওয়াজিব। তবে তিনটি জিনিসের মধ্যে থেকে যেকোনো একটি পালনের মাধ্যমে এটা আদায় হয়ে যাবে। যেমন : ১০ (দশ) জন মিসকিনকে খাওয়ানো অথবা কাপড় দেওয়া অথবা একজন গোলাম আজাদ করা।[৪১]

দুই. মানদূব (المندوب) **বাঞ্ছনীয়**

মানদূব-এর পরিচয়

মানদূব-এর শাব্দিক অর্থ : মানদূব مندوب একটি আরবী শব্দ। যার অর্থ : আহ্বান করা, উৎসাহিত করা, আহূত, কাঙ্ক্ষিত, আমন্ত্রণ করা, দায়িত্ব দেওয়া ও অনুরোধ করা। বলা হয়, نَدَبَ القومَ الى الأمر—জাতিকে কোনোকিছুর দিকে আহ্বান করা হয়েছে এবং উৎসাহিত করা হয়েছে। ندبه للأمر—তাকে ডেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং অনুরোধ করা হয়েছিল। مندوب অর্থ বাঞ্ছনীয়।[৪২]

মানদূব-এর পারিভাষিক অর্থ : মানদূব হলো আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মুকাল্লাফ বান্দার কাছে বাধ্যতামূলক ছাড়া কোনো কাজ করার আদেশ। যা পালন করলে তার জন্য সাওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে, কিন্তু পালন না করলে কোনো গুনাহ বা শাস্তি নেই।[৪৩]

৪১. আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৬-২৮।

৪২. ইব্রাহীম মোস্তফা ও অন্যরা, ***আল-মু'জামুল ওয়াসীত*** (কায়রো : মাজমাউল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, দারুদ দাওয়াহ, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৯১০; কালা'আজী, মুহাম্মদ রাওয়াস, ***মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*** (জর্দান : দারুন নাফায়িস, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৪৭৭।

৪৩. আল-গাযালী, আবু হামেদ, ***আল-মুস্তাসফা*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৬০; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজিব ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৩৩৩; আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ২৮।

মানদূব চেনার উপায় বা সীগাহসমূহ

যে পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে মানদূব চিহ্নিত হবে। কুরআন-সুন্নাহতে এরকম অনেক উপায় রয়েছে,[৪৪] সেগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম—

১. আদেশমূলক আমরের যে সীগাহসমূহে আবশ্যিকভাবে না হওয়ার জন্য দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন : মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিখে রেখো।'[৪৫]

উক্ত আয়াতের মধ্যে (فَاكْتُبُوهُ) শব্দটি আমরের সীগাহ, এটা মূলত ওয়াজিব/ফরয হওয়ার ওপর প্রমাণবহন করে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে বুঝা যায় এখানে আমর বা নির্দেশনা ওয়াজিব/ফরয-এর জন্য নয় সুতরাং এটা مندوب (মানদূব)-এর ফায়দা দেবে।

২. প্রত্যেক খবরিয়্যাহ বা বর্ণনামূলক বাক্য যেগুলোতে কোনো কাজ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং আমর বা আদেশের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। যথা– যে-সকল বাক্য দ্বারা যিকির এবং নফল ইবাদতকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজগুলো প্রায় সবসময় করেছেন, মাঝেমধ্যে ছেড়েছেন সেই কাজগুলো মানদূব। যেমন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম-এর ফরজ সালাতের আগে ও পরের নফল সালাতসমূহ তেমনইভাবে তাঁর নফল সাওম ইত্যাদি।

৪. শরী'য়াতের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও যেসব কাজ বাস্তবায়ন না করলে শরী'য়াতে শাস্তির বিধান নেই, সেই কাজগুলো মানদূব। যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ»

[৪৪] আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজিয ফী-উসূলিল ফিকহিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৩৩৬।

[৪৫] আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৮২।

'নিশ্চয় আল্লাহ্ যেমন তাঁর আযীমাতসমূহ (স্বাভাবিক অবস্থায় অনুসৃত মূল বিধান) পালন করা পছন্দ করেন, ঠিক তেমনইভাবে তাঁর রুখসাতসমূহ (বিশেষ অবস্থায় ছাড় ও সুবিধাগুলো) পালন করাও পছন্দ করেন।'[৪৬]

এরপরও অনেক ক্ষেত্রে কেউ যদি রুখসাত গ্রহণ না করে, তাহলে তার জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই।

৫. শরী'য়াতের টেক্সট বা 'নাস'-এ সুন্নাহ কিংবা মানদূব শব্দের সরাসরি ব্যবহার মানদূবের আলামত। যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস,

«إن رمضان شهر افترض الله عز وجل صيامه، وإني سننت للمسلمين قيامه»

'নিশ্চয় রামাদ্বান এমন একটি মাস যে মাসের সাওম রাখা আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের জন্য ফরয করেছেন এবং আমি এই মাসে কিয়ামুল লাইল সুন্নাত করেছি।'[৪৭]

মানদূব-এর উপনামসমূহ (ألقاب)

১. السنة (আস-সুন্নাহ) সুন্নাহ বা মাসনূন।

২. النافلة (আন-নাফিলাহ) বা নফল।

৩. المستحب (আল-মুস্তাহাব) বা মুস্তাহাব।

৪. التَّطَوُّع (আত-তাত্বাওয়ু') বা ইচ্ছাধীন।

৫. الفضيلة (আল-ফাদ্বীলাহ) ফযীলত।[৪৮]

মানদূব-এর স্তরসমূহ

সব মানদূব একই মানের নয়, তাই মানদূবের কয়েকটি স্তর ও পর্যায় রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো—

[৪৬] আল-হাইসামী, নূরুদ্দীন, ***মাওয়ারিদুয যাময়ান*** (দামিশ্‌ক : দারুস সাকাফাহ, ১ম প্র., ১৯৯০-১৯৯২ খ্রি.), হাদীস নং ৯১৪, খ. ৩, পৃ. ২২০।

[৪৭] ইমাম আহমদ, ***আল-মুসনাদ*** (কায়রো : দারুল হাদীস, ১ম প্র., ১৯৯৫ খ্রি.), হাদীস নং ১৬৮৮, খ. ২, পৃ. ৩২০।

[৪৮] আল-মিনয়াবী, মাহমূদ ইবনু মুহাম্মদ, ***আশ-শারহুল কবীর লি-মুখতাসারিল উসূল***, পৃ. ১১৪।

১. তাকীদপূর্ণ সুন্নাত سنة مؤكدة (সুন্নাহ মুওয়াক্কাদাহ) এটা এমন সুন্নাত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় পালন করেছেন এবং উম্মতকে পালনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। এ ধরনের কাজ পরিত্যাগ করা তিরস্কারযোগ্য ও নিন্দনীয়।

উদাহরণ—ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাত সালাত। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন—'ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সালাত দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা-কিছু রয়েছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।'[৪৯]

২. তাকীদ দেওয়া হয়নি এমন সুন্নাত سنة غير مؤكدة (সুন্নাহ গায়রে মুওয়াক্কাদাহ) এটা এমন ধরনের সুন্নাত যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় পালন করেননি। এটাকে মুস্তাহাবও বলা হয়।

যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নফল সাওম রাখতেন আবার কখনোও রাখতেন না। আসরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত সালাতও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩. ফাদ্বীলাহ বা আদব فضيلة و أدب (ফাদ্বীলাহ ওয়া আদব) : এটাকে সুন্নাতে আদত ও আদব বা শিষ্টাচারও বলা হয়। ইবাদত ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য কাজকে ফাদ্বীলাহ বা আদব বলা হয়।

উদাহরণ—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পানাহার পদ্ধতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘুমানোর পদ্ধতি ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বভাবজাত কাজের স্তর ও হুকুম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজগুলো প্রাকৃতিকভাবে অথবা স্বভাবজাতভাবে করেছেন, রেসালত অনুসারে নয় সেগুলো শরী'য়াত কিংবা ইবাদত নয়। এই ধরনের কাজগুলিকে 'আল-আফ'আল আল-জিবিল্লিয়্যাহ' (الأفعال الجبلية) বা স্বভাবজাত কাজ বলে, তা দু'প্রকার।[৫০] যথা—

[৪৯] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৭২৫।

[৫০] আল-আশকার, মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান, *আফ'আলুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া দালালাতিহা 'আলাল-আহকাম* (বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ৬ষ্ঠ প্র.; ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১৯-২৩৬।

এক. এমন কাজ যা স্বভাবজাত তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা ছাড়া করেছেন। যেমন : কোনোকিছুতে আনন্দিত হলে তাঁর মুখমণ্ডল আলোকিত হয়ে যেত। আবার যদি তিনি কোনোকিছু ঘৃণা করতেন তাঁর মুখে সেটা দেখা যেত। অনুরূপভাবে খাবারের মধ্যে 'দব্ব' বা ষাণ্ডা অপছন্দ করতেন অথচ অন্যদের খেতে অনুমতি দিয়েছেন।[৫১] এই ধরনের কাজসমূহের হুকুম হলো, এগুলো ইচ্ছা ব্যতীত ঘটেছে; যার জন্য এগুলো 'তাকলীফের আওতার বাইরে এবং সেই কারণেই এগুলো অনুসরণ করা বা লঙ্ঘন করার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং এগুলোর সঙ্গে সাওয়াব বা গুনাহের সম্পৃক্ততা নাই, বরং মুবাহ পর্যায়ের হবে; করতে চাইলে করতে পারবে আর ইচ্ছা না হলে ত্যাগ করতে পারবে।

দুই. যে কাজগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবজাত এবং স্বেচ্ছায় করেছেন, তবে মানবীয় প্রয়োজনে যেমন : খাওয়াদাওয়া, প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা, হাঁটাচলা, মাটির ঘর গ্রহণ করা, ঘুমোনো, চিকিৎসা গ্রহণ করা, আঙুল দিয়ে খাওয়া, পাত্র থেকে হাত দিয়ে পানি নিয়ে ওযু করা ইত্যাদি। আবার এই স্বভাবজাত স্বেচ্ছায় করা কাজগুলো দু'প্রকার; হয়তো ইবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকবে, না হয় থাকবে না।

(ক) যে কাজগুলোর সঙ্গে ইবাদতের কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্দিষ্ট কিছু খাবার গ্রহণ যথা : খেজুর, মধু, নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক পরিধান করা। উসূলবিদগণ বলেছেন, এই ধরনের কাজগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবজাতভাবে ইচ্ছাকৃত করেছেন, এগুলোতে কোনো হুকুম 'তাকলীফী' নাই; ফলে এখানেও অনুসরণ-অনুকরণের কিছু নেই, বরং মুবাহ পর্যায়ের হবে; করতে চাইলে করতে পারবে, আর ইচ্ছা না হলে ত্যাগ করতে পারবে। তা দ্বারা মুস্তাহাব বা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে না, যদি না এর সঙ্গে অন্য কোনো আলামত কিংবা প্রমাণ থাকে, অথবা ইবাদতের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়। তাই কেউ যদি চামচ দিয়ে খায় কিংবা ট্যাপ থেকে, বেসিন থেকে ওযু করে, তাহলে সে সুন্নাত

[৫১] ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং ১৯৪৫, খ. ৩, পৃ. ১৫৪৩। হাদীসটির আরবী টেক্সট,

«عن عبد الله بن عباس، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد، مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله ﷺ بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله ﷺ يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»، قال خالد: فاجترته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر»

থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো বলা যাবে না; কারণ এটি 'মুবাহ'কে 'মুবাহ' বিশ্বাস করে ছেড়ে দেওয়া, এটি জায়েয এবং এতে কোনো সমস্যা নেই।[৫২]

তবে অনেক উসূলবিদ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবাহ কাজগুলোর অনুসরণ, অনুকরণ করা মানদূব বা মুস্তাহাব। সুতরাং এই কাজগুলো কেউ যদি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণের নিয়তে تأسياً করে। তাহলে সাওয়াব পাবে।[৫৩] এ ধরনের কাজগুলোর বিভিন্ন অবস্থা, পর্যায় ও স্তর রয়েছে–

প্রথম স্তর : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত স্বভাবজাত কোনো কাজ বিশেষ পদ্ধতিতে করার পর যদি তার সঙ্গে মৌখিক কোনো নির্দেশ জড়িয়ে যায়, তখন সেটা আলোচ্য বিষয় থেকে বের হয়ে 'কাওলী' প্রমাণ বা মৌখিক নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা মানদূব বা সুন্নাত হবে। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পান করতেন তিন শ্বাসে পান করে বলতেন, এতে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করা হয়, পিপাসা দূরীভূত হয় এবং এটা অধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যকর।[৫৪]

দ্বিতীয় স্তর : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বভাবজাত কোনো কাজ সবসময় সুনির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতিতে পালন করেছেন, অথবা বারবার করেছেন। যেমন : পানাহার করার পদ্ধতি, ঘুমোনোর পদ্ধতি ইত্যাদি। ফলে এগুলোতে আইন ও বিধি-উদ্দেশ্য থাকার সম্ভাবনা আছে; যেহেতু সবসময় করেছেন, সুতরাং এগুলো মুস্তাহাব হবে। অনুরূপভাবে এগুলো শুধুই স্বভাবজাত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে; যেহেতু ইবাদত হিসাবে করেননি, ফলে মুস্তাহাব হবে না। এজন্য এই বিষয়ে দুটি মত দেখা যায়।

○ অধিকাংশ ইমামদের মতে এটি মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেশিরভাগ কাজে

---

৫২. আল-আশকার, ***আফ'আলুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া দালালাতিহা আলাল-আহকাম***, খ. ১, পৃ. ২২৫।

৫৩. আল-গাযালী, আবু হামেদ, ***আল-মুস্তাসফা***, পৃ. ২৭৫; আল-জাস্সাস, আহমদ ইবনু আলী, ***আল-ফুসূল ফিল-উসূল*** (কুয়েত: ধর্ম মন্ত্রানালয়, ২য় প্র; ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২২১; আল-মারদাওয়ী, আলাউদ্দীন, ***আত-তাহবীর শারহুত তাহরীর*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্র; ২০০০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৪৫৬।

৫৪. ইমাম আবূ দাউদ, সুলাইমান, ***আস-সুনান***, (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.), হাদীস নং ৩৭২৭, খ. ৩, পৃ. ৩৩৮। হাদীসটির মূল ইবারত,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: " إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ، وَأَبْرَأُ ".

তাশরী' বা আইন থাকে; কারণ তিনি শরী'য়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা দেওয়ার জন্য প্রেরিত। তাই কোনো কাজ বিশেষ পন্থায় সবসময় করাটা অনুকরণীয় ও মানদূব হওয়ার প্রমাণবহন করে।[৫৫]

○ দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজগুলো শুধু 'মুবাহ' বা ঐচ্ছিক হওয়াই প্রমাণ করে, এর বেশি কিছু নয়; কারণ কোনো কাজ সবসময় করাটা সে কাজটি দ্বারা আইন উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় না; কেননা প্রায়শই একজন ব্যক্তি একই ধরনের কাজগুলো একরকমভাবে করে যাতে চিন্তা-বুদ্ধির সাশ্রয় হয় এবং বেশি চিন্তাভাবনা করতে না হয়। যেহেতু এটি মানুষের প্রকৃতি সেহেতু এখান থেকে 'মুবাহ' বা ঐচ্ছিক-এর অতিরিক্ত কোনো বিধান প্রমাণিত হয় না।[৫৬]

তৃতীয় স্তর : যে কাজগুলো স্বভাবজাত এবং মাঝেমধ্যে করেছেন কিংবা হঠাৎ করেছেন, কিন্তু সবসময় করেননি, যেমন : যাতায়াতের সময় কোনো জায়গায় নেমে পড়া, অথবা সঙ্গে থাকা পানি থেকে কোনো গাছের গোড়ায় ছিটানো, কিংবা তাঁর যাত্রা রাস্তার কোনো একপাশ দিয়ে চলা ইত্যাদি। তবে এগুলো কি অনুকরণীয় ও অনুসরণযোগ্য মুস্তাহাব?

ইবনু 'উমার রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এগুলো অনুকরণ পছন্দ করতেন। কিন্তু চার খলিফা এবং অধিকাংশ সাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম এগুলোকে মুস্তাহাব মনে করতেন না; কেননা কোনো কাজ মুস্তাহাব ও অনুকরণীয় হওয়ার জন্য অবশ্যই সেখানে ইবাদতের ইচ্ছা থাকতে হবে। যেহেতু এ কাজগুলোতে ইবাদত উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এগুলো হঠাৎ সংঘটিত কাজ, তাই এগুলো অনুকরণ করা মুস্তাহাব হবে না। কিন্তু ইবনু 'উমার রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এ ধরনের কাজগুলোতে ইবাদতের ইচ্ছা না থাকলেও যেভাবেই হোক না কেন এ কাজগুলোই উত্তম। হয়তো তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে এগুলো করতেন, কিংবা হুবহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণের জন্য। অবশ্য ইবনু 'উমার কিংবা অন্য কোনো সাহাবী কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজের পদ্ধতি ও ধরনের অনুকরণ করতেন ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া, তবে কোনো জায়গার উদ্দেশ্যে যেতেন না; কারণ সমস্ত সাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম এ বিষয়ে একমত যে, শরী'য়াত কোনো জায়গাকে

---

৫৫. আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিকহ***, খ. ৬, পৃ. ২৩-২৫।

৫৬. আল-আশকার, মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৭।

মহিমান্বিত করলে কেবল সেই জায়গারই সম্মান করা যাবে, এ ছাড়া অন্য কোনো জায়গার নয়।[৫৭]

(খ) স্বভাবজাত ও স্বেচ্ছায় করা যে কাজগুলোর সঙ্গে ইবাদতের সম্পর্ক আছে। এগুলো হয়তো ইবাদতের মাঝখানে কিংবা ইবাদতের উপায়সমূহে ঘটেছে, অথবা ইবাদতের একটু পূর্বে কিংবা পরপর।

ইবাদতের মাঝখানে যেমন : হজ্জে তাওয়াফ ও সা'ঈ করার সময় আরোহণ করা, ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য আতর মাখানো, মক্কা এবং মিনার মধ্যে 'মুহাস্‌সব' নামক জায়গায় নামা, খুৎবা দেওয়ার সময় হাতে লাঠি নেওয়া, দুই খুৎবা দাঁড়িয়ে দেওয়া এবং মাঝখানে বসা, প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সিজদাহ শেষে দাঁড়ানোর আগে সামান্য বসা ইত্যাদি। এ কাজগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত হওয়ার কারণে করেছেন, অথবা এগুলো জায়েয বোঝানোর জন্য করেছেন, উভয় সম্ভাবনা আছে।

ইবাদতের উপায়ে ঘটা কাজ যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় 'বনী শীবাহ'র দরজা দিয়ে প্রবেশ করা, ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য পথে ফেরা, হজ্জে মক্কায় কুদাই রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করা ইত্যাদি।

ইবাদতের একটু পূর্বে ঘটেছে যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকাত সুন্নাহর পরে ফরযের আগে ডান কাতে একটু শুয়ে থাকতেন।

ইবাদতের পরপরই ঘটেছে যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষে ডানদিকে কিংবা বামদিকে সরে যাওয়া।[৫৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বভাবজাত, সেচ্ছায় করা যে কাজগুলোর সঙ্গে ইবাদতের সম্পর্ক আছে সেগুলোকে একত্র করে—এ সম্পর্কে ইমামদের মতামতসহ গবেষণা করে উসূলবিদগণ নিম্নোক্ত হুকুম ও মান নির্ধারণ করেছেন।[৫৯]

[৫৭] ইবন তাইমিয়্যাহ, তাকীউদ্দীন, *মাজমূ' আল-ফাতাওয়া* (মদীনা : বাদশাহ ফাহাদ আল-কুরআন কমপ্লেক্স, ১৪১৬ হি.), খ. ১০, পৃ. ৪১১; আল-আশকার, মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান, ***আফ'আলুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া দালালাতিহা আলাল-আহকাম***, খ. ১, পৃ. ২২৯।

[৫৮] আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্‌হ***, খ. ৬, পৃ. ২৪; আল-আশকার, মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩২।

[৫৯] আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্‌হ***, খ. ৬, পৃ. ২৬।

১. যেগুলো ওয়াজিব পর্যায়ের; ইবাদতের অংশ হওয়ার কারণে। যেমন : ইমাম শাফি'য়ী (রাহ.) [১৫০-২০৪ হি.] -এর মতে দুই খুৎবার জন্য দাঁড়ানো এবং মাঝে বসা ওয়াজিব।

২. যেগুলো মানদূবের পর্যায়ের; যেখানে ইবাদতের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে কিংবা আলামতে বুঝা গেছে, যেমন : বেজোড় সংখ্যা খেজুর দিয়ে ইফতার করা, বাইতুল্লাহর ভেতরে সালাত পড়া, খুৎবার সময় হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ইত্যাদি।

৩. যেগুলো ইবাদত হওয়া না হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। যেমন : হজ্জে মক্কা এবং মিনার মাঝে 'মুহাস্‌সব' নামক জায়গায় নামা, তাওয়াফ ও সা'ঈ করার সময় আরোহণ করা, ফজরের দু'রাকাত সুন্নাতের পরে ফরজের আগে ডানকাতে একটু শুয়ে থাকা। এগুলোর হুকুম নিয়ে মতান্তর দেখা যায়। তবে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, এগুলো মুবাহ বা অনুমোদিত হওয়ার চেয়ে বেশি কিছু প্রমাণ করে না। এজন্য ইবন আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, 'মুহাস্‌সব' নামক জায়গায় নামা হজ্জের অংশ নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই জায়গায় এমনিতে নেমেছিলেন।[৬০]

৪. যেগুলো ইবাদত না হওয়া স্পষ্ট। সেগুলো কেবল স্বভাবজাত কাজ হিসাবে পরিগণিত হবে এবং এগুলো কেবল মুবাহ বা অনুমোদনযোগ্য হওয়া নিয়ে কারও দ্বিমত নেই।[৬১]

তিন. হারাম (الحرام) নিষিদ্ধ

হারাম-এর পরিচয়

শাব্দিক অর্থ

হারাম আরবী শব্দ, যার অর্থ অবৈধ, নিষিদ্ধ, বারণকৃত, অপবিত্র, মন্দ বস্তু, নিন্দনীয়, বর্জনীয়, অবৈধ বিষয় বা বস্তু, যা হালালের বিপরীত।[৬২]

[৬০] ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-১৭৬৬।

[৬১] আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫; আল-আশকার, মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৩-৩৬।

[৬২] ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবন মোকাররাম, ***লিসানুল 'আরাব***, খ. ১২ পৃ. ১১৯-১২০; আল-ফাইয়ূমী, ***আল-মিসবাহুল মুনির***, খ. ১ পৃ. ১৩১; আবু হাবীব, ড. সা'দী, ***আল-কামূসুল ফিক্‌হী*** (দামিশ্‌ক : দারুল ফিক্‌র, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৮৫।

হারাম-এর পারিভাষিক অর্থ

হারাম হচ্ছে এমন সব কাজ বা বিষয়, যেগুলো থেকে আল্লাহ্ তা'আলা মুকাল্লাফ বান্দাহকে বাধ্যতামূলকভাবে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই নিষিদ্ধ কাজ বর্জনকারীকে সাওয়াব দেওয়া হবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে সেই কাজগুলো করলে শাস্তি দেওয়া হবে। যেমন : খুন, চুরি, ব্যভিচার, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া প্রভৃতি।[৬৩]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের। হানাফী ইমামগণের মতে, হারাম হচ্ছে—কোনোকিছু বর্জন করার আবশ্যকীয় কঠোর নির্দেশ যা সুনির্দিষ্ট অকাট্য বা কাত'ঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। হানাফীগণের মতে এটা ফরযের বিপরীত। তবে যদি প্রবল ধারণামূলক বা 'যান্নী' দলীলের প্রেক্ষিতে সাব্যস্ত হয়, তাহলে তা হবে মাকরূহ তাহরীমী, হারাম নয়। তাঁদের মতে এটি ওয়াজিবের বিপরীত। অবশ্য সকলের মতেই উভয় কাজ করা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তা বর্জন করলে সাওয়াব দেওয়া হবে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো; হারামকে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ তাহরীমীকে অস্বীকার করলে কাফির হবে না, ফাসিক হবে।[৬৪]

হারাম চিহ্নিত হওয়ার শব্দসমূহ

কুরআন ও সুন্নাহতে ব্যবহৃত হারামের অনেক সীগাহ বা আলামত রয়েছে। যার মাধ্যমে আমরা হারাম বিষয় চিনতে পারব। সেগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সীগাহ নিচে তুলে ধরা হলো–

১. স্পষ্ট হারাম শব্দ কিংবা তার ব্যুৎপন্ন শব্দ لفظ التحريم الصريح (লাফজুত তাহরীম আস-সরীহ)। যেমন : মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

৬৩. আশ-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী, ***ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন 'ইলমিল-উসূল*** (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম প্র.; ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭৮; খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১১৩।

৬৪. আত-তাফতাযানী, সা'দ উদ্দীন মাসউদ ইবন উমর, ***শারহুত-তালওয়ীহ 'আলাত-তাওযীহ*** (মিসর : মাকতাবাতু সাবীহ, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ১৭; আল-হানাফী, আমীর বাদশাহ, ***তাইসিরুত তাহরীর***, খ. ১, পৃ. ৩৭৫; আল-আনসারী, মুহাম্মদ ইবন নিযাম, ***ফাওয়াতিহুর রাহামূত শারহ মুসাল্লামিস-সুবুত*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র.; ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৮-৪৯।

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।'[৬৫]

২. অনুমোদনযোগ্য নয় বা হালাল না হওয়া نفي الحل (নাফইউল হিল্ল)। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ﴾

'তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেওয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোনো স্বামীর সঙ্গে বিয়ে করে না নেবে, (অতঃপর তাদের মধ্য তালাক না হবে) তার (প্রথম স্বামীর) জন্য হালাল হবে না।'[৬৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ»

'এক মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের অধিক কথা না বলে থাকা হালাল নয়।'[৬৭]

৩. নিষেধসূচক সীগাহ صيغة نهي এটা বিভিন্নরকম হতে পারে। যথা—

(ক) সুস্পষ্ট নিষেধমূলক 'নাহয়ি' বা তার ব্যুৎপন্ন শব্দ لفظ النهي الصريح (লাফজুন নাহি আস-সরীহ)। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾

'আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলতা অসংগত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন।'[৬৮]

(খ) ধমক দেওয়ার শব্দ, এটিও নিষেধমূলক শব্দের অন্তর্ভুক্ত صيغة زجر (সিগাতু যাজার)। যেমন : হাদীসে এসেছে,

৬৫. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৭৫।

৬৬. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৩০।

৬৭. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৬০৭৩; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-২৫৬০।

৬৮. আল-কুরআন, ১৬ (সূরা আন-নাহল) : ৯০।

«عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب و السنور؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك»

অর্থাৎ 'আবু যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, আমি জাবের রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে কুকুর এবং বিড়াল বিক্রি করে পাওয়া মূল্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে ধমক দিয়েছেন।'[৬৯]

(গ) বিরত থাকার নির্দেশ, এই সীগাহও নিষেধমূলক শব্দের অন্তর্ভুক্ত صيغة الأمر بالانتهاء (সিগাতুল আমরি বিল ইনতিহা)। যেমন : মহান আল্লাহ্ নাসারাদেরকে বলেন,

﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ﴾

'আর তোমরা এ কথা বলো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তিনের এক; এ কথা থেকে বিরত থাকো (পরিহার কর) তোমাদের মঙ্গল হবে।'[৭০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يأتي الشيطانُ أحدَكُم، فيقولُ: مَن خَلَقَ كذا؟ مَن خَلَقَ كذا؟ حتى يقولَ: مَن خَلَقَ ربَّكَ؟! فإذا بَلَغَهُ؛ فليَستَعِذْ باللهِ ولْيَنْتَه»

'অর্থাৎ শয়তান তোমাদের মধ্যে কোনো একজনের নিকট এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? এটা কে সৃষ্টি করেছে? এমন কী বলে যে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন তোমরা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ ব্যাপারে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং এর থেকে বিরত থাকবে।'[৭১]

(ঘ) না-বোধক 'মুদারি' সীগাহও নিষেধসূচক শব্দের অন্তর্ভুক্ত صيغة الفعل المضارع المقترن بـ "لا" الناهية (সিগাতুল ফি'লি আল-মুযারি' আল-মুক্বতারিন বি-লা আন-নাহিয়াহ) যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

[৬৯] ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-১৫৬৯।

[৭০] আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১৭১।

[৭১] ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৩২৭৬; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-১৩৪।

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾

'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না।'[৭২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يبع بعضكم على بيع بعض»

'তোমরা একজনের বেচাকেনার মধ্যে অন্যজন বেচাকেনা করো না।'[৭৩]

৪. কোনোকিছু বর্জন করার আদেশ হারাম হিসাবে চিহ্নিত صيغة الأمر بالترك (সিগাতুল আম্‌র বিত-তার্‌ক) যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'হে মুমিনগণ এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ আর কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো—যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।'[৭৪]

যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»

'তোমরা সাতটি জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকো সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন সেগুলো কী কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শির্‌ক করা, জাদু, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, এতিমের সম্পদ ভোগ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পলায়ন করা এবং কোনো সৎচরিত্রবান নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া।'[৭৫]

[৭২] আল-কুরআন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা) : ৩২।

[৭৩] ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-১৪১২।

[৭৪] আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়েদা) : ৯০।

[৭৫] ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-২৭৬৬; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-৮৯।

৫. যে কাজ করলে পার্থিব অথবা পরকালের শাস্তি অথবা শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা রয়েছে। এ ধরনের শাস্তিযোগ্য কাজগুলো হারাম হওয়ার প্রমাণ। তা কয়েক প্রকার। যথা –

(ক) কাজের নির্দিষ্ট শাস্তি বর্ণনা, যেমন : 'হাদ' শাস্তিসমূহ عقوبة الحدود ('উকূবাতুল হুদূদ) বা শাস্তির পরিমাণ ও যে আচরণের কারণে এ দণ্ড দেওয়া হয় তার ধরন উভয়ই সুনির্দিষ্ট; এই কাজগুলো হারামের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا﴾

'তোমরা যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও।'[৭৬]

এ ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে।'[৭৭]

অতএব, চুরি ও ব্যভিচার করলে শরী'য়াতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও ধরনের শাস্তির বিধান আছে। এজন্য এগুলো এবং এরকম আরও যা আছে সব হারাম।

(খ) যে কাজে শাস্তির ভয় প্রদর্শন রয়েছে التهديد بالعقاب (আত-তাহদীদ বিল-ইক্বাব) এ ধরনের কাজ হারাম হিসাবে চিহ্নিত। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীতে,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾

'নিশ্চয় যারা এতিমদের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের পেটে আগুনই খাচ্ছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে দগ্ধ হবে।'[৭৮]

[৭৬] আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়েদা) : ৩৮।
[৭৭] আল-কুরআন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ২।
[৭৮] আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১০।

(গ) যে কাজ করলে আল্লাহ্ কিংবা রাসূলের অভিসম্পাত বর্ষণের কথা আছে; যা মূলত এক প্রকারের শাস্তি। (ترتيب اللعنة على الفعل) এ ধরনের কাজও হারাম। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

'আর তাদের চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাৎ সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই ওইসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখো, জালিমদের ওপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত রয়েছে।'[৭৯]

যেমন এই হাদীসে,

«قال عبد الله: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله تعالى» مالي لا ألعن من لعن النبي ﷺ، وهو في كتاب الله: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ٧]»

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক সেসব নারীদের ওপর যারা শরীরে উলকি অঙ্কন করে এবং যারা অঙ্কন করায়, আর যারা চুল, ভ্রু তুলে ফেলে, আর যারা সৌন্দর্যের জন্য সম্মুখের দাঁত কেটে সরু করে, দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে, যা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।'[৮০]

অতএব, এ কাজগুলো হারাম।

৬. যে কাজ পাপের বলে শরী'য়াতে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে (وصف الفعل بأنه من الذنوب) এ ধরনের কাজ হারাম হিসাবে চিহ্নিত। যেমন : হাদীসে এসেছে,

[৭৯] আল-কুরআন, ১১ (সূরা হূদ) : ১৮।
[৮০] ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৫৯৩১; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-৫৪৬৬।

«مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرَه لَهُ فِي الآخرة: مِثْلُ البَغْيِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মতো মারাত্মক আর কোনো পাপ নেই, যার শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা ত্বরিত দুনিয়াতে দেন এবং আখিরাতের জন্যও জমা রাখেন।'[৮১]

৭. যে কাজ মুনাফিক, কাফির অথবা শয়তানের কাজ হিসাবে উল্লেখ হয়েছে। এরূপ কাজ হারাম হিসাবে চিহ্নিত। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

'অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্ তা'আয়ালার সঙ্গে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন একান্ত আলস্যভরেই কেবল লোক দেখানোর জন্যই দাঁড়ায়। আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে।'[৮২]

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾

'তোমাদের মধ্যে যে তাদের সঙ্গে (ইয়াহুদী ও নাসারা) বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'[৮৩]

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

'নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই।'[৮৪]

---

[৮১] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৯০২; ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৫১১।

[৮২] আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১৪২।

[৮৩] আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়েদাহ) : ৫১।

উল্লেখ্য, আল-কুরআন ও আস- সুন্নাহতে কখনো কখনো হারামকে মাকরূহ শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾

স্পষ্ট কতক হারাম কাজের বর্ণনার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—'এসব মন্দ কাজগুলো আপনার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়।'[৮৫] উক্ত আয়াতে অপছন্দনীয় দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য।

হারামের প্রকার : হারাম দুই প্রকার।

১. নিজস্ব কারণে হারাম বা محرم لذاته (মুহাররামুন লি-যাতিহি) বা মূলগতভাবে যেটা নিষিদ্ধ; সহজাত হারাম অর্থাৎ যেটা আল্লাহ্ প্রথম থেকেই হারাম করেছেন। যেমন : খুন, ব্যভিচার, চুরি, শূকর খাওয়া ইত্যাদি।

২. অন্যের কারণে হারাম বা محرم لغيره (মুহাররামুন লি-গাইরিহি) অর্থাৎ কোনো কাজ মূলত বৈধ ছিল কিন্তু অন্য কোনো কারণে, পরিস্থিতিতে তা হারামে পরিণত হয়েছে। যেমন : ক্রয়-বিক্রয় শরী'য়াতে বৈধ, কিন্তু জুমার প্রথম আজান শোনার পর ক্রয়-বিক্রয় হারাম। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত হওয়ার কারণে জুমা বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনুরূপভাবে বিবাহযোগ্য কোনো নারীর কাছে বিবাহের উদ্দেশ্যে বাগদানের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ, কিন্তু যখন জানা যাবে, উক্ত নারী অন্য কোনো পুরুষের বাগদত্তা। তখন তাকে প্রস্তাব দেওয়া হারাম; কারণ, হাদীসে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে; যাতে মুসলিমদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি না হয়। অবশ্য যেকোনো পক্ষ যদি আগের প্রস্তাব বাতিল করে তাহলে নতুন প্রস্তাব দেওয়া যাবে। তেমনইভাবে একই কারণে একজনের ক্রয়-বিক্রয়ে দামাদামি চলাকালীন একই বিষয়ে আরেকজন দামাদামি করা হারাম।

হারাম লি-যাতিহি ও হারাম লি-গাইরিহি-এর মধ্যে পার্থক্য

১. হারাম লি-যাতিহি কিংবা আল-হারামুয যাতী বা সহজাত হারাম হচ্ছে মূলতই অবৈধ এবং বাতিল। কিন্তু হারাম লি-গাইরিহি বা অন্য কোনো কারণে হারাম হওয়া বিষয়গুলো, তা মূলত বৈধ। তাই নিষিদ্ধ হওয়া

---

[৮৪] আল-কুরআন, ১৭ (সূরা বনী ইসরাঈল) : ২৭।

[৮৫] আল-কুরআন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা) : ৩৮।

সত্ত্বেও উক্ত কাজগুলো যদি শর্তাবলি ও মূল উপকরণসহ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে বৈধ হয়ে যাবে এবং এই কাজগুলোর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ হয়, অবশ্য নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণে গুনাহ হবে।[৮৬]

২. আরেকটি পার্থক্য হলো, মারাত্মক জরুরী পরিস্থিতিতে জীবনের পঞ্চ মৌলিক বিষয় বা 'জরুরীয়াতে খামসা' তথা—জীবন, ধর্ম, বুদ্ধি-বিবেক, সম্পত্তি এবং সম্ভ্রম রক্ষার্থে কিংবা হিফাজতের জন্য অনেক হারাম লি-জাতিহি শর্তসাপেক্ষে অনুমোদনযোগ্য। যেমন—জীবন বাঁচানোর একান্ত জরুরী পরিস্থিতিতে মৃত কিংবা হারাম গোশ্ত খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, অনুরূপভাবে বাধ্য হলে অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান রেখে মুখে কুফুরী কথা উচ্চারণের অনুমতি ও ছাড় রয়েছে। পক্ষান্তরে জীবন বাঁচানোর একান্ত জরুরত ছাড়াও সামষ্টিক অস্বাভাবিক দুঃখকষ্ট, বা 'হাজিয়াত' যখন 'জরুরত'-এর স্থলাবিষিক্ত হয় অর্থাৎ অসহনীয় ও অতি কষ্টের কারণ হয় এবং শরী'য়াহর কোনো মূলনীতি পরিপন্থি না হয়, তখন তা লাঘব করার জন্যও কখনো হারাম লি-গাইরিহি অবলম্বন করার অনুমতি বা ছাড় রয়েছে বলে উসূলবিদগণ মত দিয়েছেন।[৮৭]

চার. মাকরূহ (المكروه) নিন্দনীয়

মাকরূহ-এর আভিধানিক অর্থ

মাকরূহ (مكروه) এর মূলধাতু হলো 'كره' যার অর্থ : অপ্রিয়, ঘৃণিত, নিন্দিত, অপছন্দনীয়, কষ্ট এবং অসন্তুষ্টি। সুতরাং মাকরূহ অর্থ হলো—নিন্দনীয়, অপছন্দনীয়।[৮৮]

---

[৮৬] আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ***, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭; খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১০৮; আন-নাম্লাহ, আব্দুল করীম ইবনু আলী, ***আল-মুহাযযাব ফী উসূলিল ফিক্হিল মুকারন***, খ. ৩, পৃ. ১৪৫০;।

[৮৭] ইবনু কাইয়্যিম আল-জাউযিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইবন আবু বকর, ***'ইলামুল মুয়াক্কী'ঈন*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র.; ১৯৯১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৯; আল-ওয়াকীলী, মুহাম্মদ, ***ফিক্হুল আউলাওয়িয়্যাত: দিরাসাতুন ফী-যযাওয়াবেত*** (ভার্জিনিয়া: আল-মা'হাদুল আ'লামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১ম প্র.; ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৪৯। এই প্রেক্ষিতেই প্রণীত হয়েছে, প্রসিদ্ধ ফিক্হী কা'য়িদাহ "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" ('হাজিয়াত' কখনো কখনো 'জরুরত'-এর স্থলাবিষিক্ত হয়)।

[৮৮] আল-ফাইরোযাবাদী, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু ইয়া'কুব, ***আল-কামুসুল মুহীত্ব*** (বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৫২; আল-ফাইয়ূমী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবনু আলী, ***আল-মিসবাহুল মুনির***, খ. ২, পৃ. ৫৩২।

মাকরূহ-এর পারিভাষিক অর্থ

মাকরূহ বলতে বোঝানো হয় এমন বিষয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা 'মুকাল্লিফ' বান্দাদের বর্জন করতে নির্দেশ দেন, কিন্তু সেটা আবশ্যিকভাবে নয়। তবে কেউ যদি শরী'য়াত প্রণেতার আদেশ হিসাবে আনুগত্যের ভিত্তিতে মাকরূহ কাজ বর্জন করে, তাহলে সে সাওয়াব লাভ করবে। কিন্তু মাকরূহ কাজ করলে শাস্তির সম্মুখীন হবে না।[৮৯]

মাকরূহ হচ্ছে মানদূবের বিপরীত। এজন্য অনেকে বলেছেন—মানদূব উপেক্ষা করা মাকরূহ। মাকরূহ বর্জন করা প্রশংসনীয় কাজ, কেননা মাকরূহ এমন কাজ যা করার চেয়ে বর্জন করা উত্তম।[৯০]

মাকরূহ-এর সীগাহ বা যেসব শব্দ দ্বারা মাকরূহ চিহ্নিত হবে

শরী'য়াতের বিধিবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে মাকরূহ বলে শনাক্ত হয় এমন সীগাহ, শব্দ, ব্যবহার তিন প্রকার—

১. কুরআন-সুন্নাহতে ব্যবহৃত মাকরূহ শব্দ বা এর ব্যুৎপন্ন শব্দসমূহ, অথবা অন্য শব্দ যা মাকরূহের সমার্থক। এগুলো দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে মাকরূহ চিহ্নিত হয়। যেমন–

(ক) মাকরূহ শব্দের মূল ধাতু থেকে মাকরূহ শনাক্ত হওয়ার উদাহরণ–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেছেন অনর্থক গল্পগুজব করা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ অপচয় করা।'[৯১]

(খ) মাকরূহর সমার্থক শব্দ যার ব্যবহার মাকরূহ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তার উদাহরণ—

ইবনু 'উমর রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[৮৯] আল-'উসাইমিন, মুহাম্মদ ইবনু সালেহ, ***আল-উসূল মিন 'ইলমিল উসূল*** (মিসর : দারু ইবন জাউযি, ৪র্থ প্র; ২০০৯), পৃ. ১২; আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*** , পৃষ্ঠা-৪২।

[৯০] আবু যাহরাহ, ***উসূলুল ফিক্হ***, পৃ. ৪৬।

[৯১] ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-১৪৭৭; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-৫৯৩।

«ابغض الحلال إلى الله الطلاق»

'মহান আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল হচ্ছে তালাক।'[৯২]

২. সকল নিষেধসূচক শব্দ (نهي) নাহয়ী-এর সীগাহ, যেগুলো হারাম-এর জন্য ব্যবহৃত না হওয়া অন্য কেনো দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এসব নিষেধাজ্ঞার আকারে মাকরূহ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«الشفاء في ثلاثة: في شرطةِ مِحْجم، أو شربة عسل، أو كيَّةٍ بنار، وأنا أنهي أمتي عن الكيِّ»

'তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগমুক্তি আছে; মধু পানে, হিজামা বা শিঙা লাগানোতে, আগুন দিয়ে গরম সেক দেওয়াতে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম সেক দেওয়া থেকে নিষেধ করছি।'[৯৩]

উক্ত হাদীসে আগুন দিয়ে গরম সেক দেওয়া থেকে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে অন্য হাদীসে স্পষ্ট দলীল রয়েছে। আর তা হলো এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«وأكره أن يكتوي»

'আমি আগুন দিয়ে গরম সেক দেওয়া পছন্দ করি না।'[৯৪]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজগুলো শরী'য়াতে অপছন্দনীয় হওয়ার দরুন ছেড়ে দিয়েছেন যাকে 'আত-তুরূকুন নাবাভীয়্যাহ' (التُّرُوكُ النَّبَوِيَّة) বলা হয়-এর মাধ্যমেও মাকরূহ প্রকাশ হয়। তবে মানুষ হিসাবে স্বভাবজাত যেগুলো ছেড়ে দিয়েছেন সেগুলো নয়। যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের সঙ্গে বাইয়া'তের সময় মুসাফাহা করা ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ বাইয়া'তের সময় মুসাফাহা করা সুন্নাত এবং

---

[৯২] ইমাম আবূ দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ*, হাদীস নং-১৮৬৩, ২১৭৮; ইমাম ইবনু মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ*, হাদীস নং-২০১৮।

[৯৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং-৫৬৮০।

[৯৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং-৫৭০২।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সুন্নাত ছেড়ে দিতেন না। কিছু বর্ণনায় এসেছে, কতক মহিলা মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত সংকুচিত করেছেন; উমায়মাহ বিনতু রুকায়কাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি কতক মহিলাসহ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বাইয়া'ত হওয়ার জন্য উপস্থিত হলাম। ... অতঃপর বললাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসুন আমরা আপনার সঙ্গে হাত মিলাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে হাত মিলাই না। আমার কথা একশ মহিলার জন্য যেই রকম, একজনের জন্যও ঠিক সেই রকম।[৯৫]

অতএব, মুসাফাহা সুন্নাত হওয়াসত্ত্বেও এখানে ছেড়ে দেওয়া উদ্দেশ্যমূলক; যেহেতু কেবল ছেড়ে দেওয়া বাদে আর কোনো প্রমাণ, ইঙ্গিত নেই তাই এটি মাকরূহ বা অপছন্দনীয় হওয়ার কারণেই।[৯৬]

মাকরূহ مكروه-এর প্রকার

প্রথমত : সকল ইমামদের মতে মাকরূহ বিশেষণের দিক দিয়ে দু'প্রকার—

১. নিজস্ব কারণে মাকরূহ বা مكروه لذاته (মাকরূহুন লি-যাতিহি) মূলগত ভাবেই যেটা মাকরূহ। যেমন : নামাজে এদিক-ওদিক তাকানো।

২. অন্যের কারণে মাকরূহ বা مكروه لغيره (মাকরূহুন লি-গাইরিহি) অর্থাৎ কোনো কাজ মূলত বৈধ ছিল কিন্তু অন্য কোনো কারণে তা মাকরূহে পরিণত হয়েছে। যেমন : মাকরূহ সময়ে সালাত পড়া মাকরূহ ওই সময়ের কারণে।[৯৭]

---

[৯৫] ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, হাদীস নং-১৭৮৩; আল-বাজী, আবুল ওয়ালিদ, **শারহুল মুয়াত্তা** (মিসর : মাতবা'য়াতুস সা'য়াদাহ, ১ম প্র., ১৩৩২ হি.) খ. ৭, পৃ. ৩০৭; ইমাম তিরমিযী, হাদীস নং-১৫৯৭; ইমাম ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-২৮৭৪। হাদীসের মূল ভাষ্য—

قالت عائشة ﵂: ما مسّت يد رسول الله ﷺ يد امرأة قطّ، غير أنه بايعهن بالكلام. متفق عليه: أخرجه البخاري، رقم ٢٥٦٤، ٤٩٨٣؛ ومسلم رقم الحديث ١٨٦٦. وقال رسول الله ﷺ: " إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة.

[৯৬] আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৪৪-৪৫।

[৯৭] আল-গাযালী, আবু হামেদ, ***আল-মুস্তাসফা***, পৃ. ৬৫।

দ্বিতীয়ত : হানাফী মাযহাবে দলীলের শক্তির বিবেচনায় মাকরূহ-কে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—

১. মাকরূহ তাহরীমী

মাকরূহ তাহরীমী হচ্ছে এমন বিষয়, যা বর্জন করার জন্য শরী'য়াত আবশ্যকীয় নির্দেশ দিয়েছে; কিন্তু এর দলীল প্রবল ধারণামূলক 'যান্নী' এবং যা বর্জন করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর করলে শাস্তিযোগ্য পাপ হবে। হানাফীগণের মতে মাকরূহ তাহরীমী হারামের কাছাকাছি এবং এটি ওয়াজিবের বিপরীত।[৯৮]

২. মাকরূহ তানযীহী

মাকরূহ তানজীহী হচ্ছে এমন বিষয়, যা শরী'য়াত বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু কঠোরভাবে নয়। মাকরূহ তানজীহী আনুগত্যস্বরূপ ত্যাগ করলে সাওয়াব পাবে, আর করলে তিরস্কার উপযোগী হবে শাস্তিযোগ্য নয়। এ ভিত্তিতে এটি মুবাহ-এর কাছাকাছি এবং মানদূবের বিপরীত। হানাফী মাযহাবের মাকরূহ তানযীহী আর জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণের পারিভাষিক মাকরূহ একইরকম।[৯৯]

হারাম এবং মাকরূহ তাহরীমীর মধ্যে পার্থক্য

হানাফী মাযহাবে 'মাকরূহ তাহরীমী' যদিও নামে মাকরূহ কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে হারামের কাছাকাছি বা এক ধরনের হারাম। হারাম ও মাকরূহ তাহরীমী উভয়ই পালন করা শরী'য়াতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং পালন করলে শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, কেউ হারাম অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে মাকরূহ তাহরীমী অস্বীকারকারী কাফির হবে না।[১০০]

---

[৯৮] আত্-তাফতাযানী, ***শারহুত-তালবীহ আলা-ততাওযীহ***, খ. ১, পৃ. ১৭; আল-আনসারী, মুহাম্মদ ইবনু নিযাম, ***ফাওয়াতিহুর রাহামূত***, খ. ১, পৃ. ৪৮-৪৯; আন-নাম্‌লাহ, আব্দুল করীম ইবনু আলী, ***আল-মুহায্‌যাব ফী উসূলিল ফিক্‌হিল মুকারন***, খ. ১, পৃ. ৩১৪।

[৯৯] আল-আনসারী, ***ফাওয়াতিহুর রাহামূত***, খ. ১, পৃ. ৪৮-৪৯; আবু যাহরাহ, ***উসূলুল ফিক্‌হ***, পৃ. ৪৬।

[১০০] আয্‌যুহাইলী, ড. ওয়াহাবাহ, ***উসূলুল ফিক্‌হ*** (দামিশ্‌ক : দারুল ফিক্‌র, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৮৬।

অন্য মাযহাবে কি মাকরূহ তাহরীমী এবং তানযীহী আছে?

'মাকরূহ'-এর প্রকারের বিবেচনায় হানাফী মাযহাব ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহে কেবল মাকরূহ তাহরীমী ছাড়া অন্য কোনো বিরোধ নেই। উসূলে ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে হুকমে শর'য়ীর অধ্যায়ে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, হানাফী মাযহাবে ছাড়া অন্য কোনো মাযহাবে মাকরূহ তাহরীমী বলতে কোনো পরিভাষা নেই; দলীলের শক্তির বিবেচনায় তাহরীমী এবং তানযীহীর এই দু'ভাগকরণ শুধুই হানাফী পদ্ধতি, অন্য মাযহাবে বা পদ্ধতিতে এর অস্তিত্ব নেই।

তবে কেউ যদি অন্যান্য মাযহাবের ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহ ভালোভাবে পড়ে, তাহলে অনেক বিষয়ে সেখানে মাকরূহ তাহরীমী এবং তানযীহীর এই দু'ভাগের নজীর লক্ষ করবে! যেমন–

১. শাফি'য়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ '*হাশিয়াতুশ শারবীনী*'তে–যে-সময়সমূহে সালাত পড়া মাকরূহ সে প্রসঙ্গে এসেছে–'মাকরূহ তাহরীমী এবং হারামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমটি এমন দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যা একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে, আর দ্বিতীয়টি যা এই সম্ভাবনা রাখে না।'[১০১]

২. আরেকটি উদাহরণ—'*ইয়ানাতুত তালেবীন 'আলা-হাল্লি আল্‌ফাযি ফাতহিল মুঈন*' গ্রন্থে এসেছে–'মাকরূহ তাহরীমী এবং মাকরূহ তানযীহীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমটি বর্জন করলে শাস্তি আছে, আর দ্বিতীয়টিতে শাস্তি নাই।'[১০২]

৩. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ '*আয্‌যাখীরাহ*'-তে এসেছে– 'ইমাম মালেক [৯৩-১৭৯ হি.] বলেছেন বাচ্চাদের সঙ্গে যে বেচাকেনা করবে, তাকে বারণ করা হবে; কেননা এই বাচ্চার গার্জেন তাকে লেনদেনের অনুমতি দিয়েছে কি না জানা নাই, তারপরও এ লেনদেন করলে মাকরূহ তানযীহী হবে।'[১০৩]

---

[১০১] আল-আনসারী, যাকারিয়া ইবন মুহাম্মাদ, ***হাশিয়াতুশ শারবীনী 'আলা-শ গুরারিল বাহীয়্যাহ*** (মিসর : আল-মাতবাআতুল মাইমুনিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২৫৯।

[১০২] আদ্-দুময়াতী, আবু বকর উসমান ইবনু মুহাম্মাদ, ***'ইয়ানাতুত তালেবীন 'আলা হাল্লি আলফাযি ফাতহিল মুঈন*** (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১ম প্র.; ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪৩।

[১০৩] আল-কারাফী, শাহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু আহমদ, ***আয্‌যাখীরাহ*** (বৈরূত : দারুল গরবিল ইসলামী; ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৫৭।

৪. হাম্বলী মাযহাবের *'আল-মুহার্‌রার'* গ্রন্থে এসেছে–'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যেকোনো কিছুর নামে শপথ করা হারাম। আরেক বর্ণনা মতে মাকরূহ তানযীহী।'[১০৪]

অতএব, এ কথা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, হানাফী মাযহাব ছাড়াও প্রসিদ্ধ অন্য তিন মাযহাবে মাকরূহ তাহরীমী এবং তানযীহী এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এই বিভক্তির বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যদিও উসূলে ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে এই বিষয়টি ঢালাওভাবে শুধুই হানাফীগণের পদ্ধতি ও মান্‌হাজ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে! অন্ততপক্ষে এ কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল যে, ওই মাযহাবসমূহের পরবর্তী পর্যায়ের ইমামগণ হানাফী মাযহাবের এই বিভক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন; যার জন্য তাঁদের ফিক্‌হী গ্রন্থসমূহে এই দ্বিবিভক্তির নজীর অহরহ দেখা যায়। অথচ এটি ত্রুটি কিংবা দোষের কিছু নয়, কারণ অন্যের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং প্রাণিধানযোগ্য পদ্ধতি ও মত গ্রহণ করা একটি সর্বসাকুল্য গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ইসলামের ইতিহাসে এর অনেক সুন্দর নজীর আছে।

অবশ্য একটি বিষয় স্বীকার করতেই হবে যে, হানাফী মাযহাবে মাকরূহে তাহরীমী ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করার বিষয়টি যে নীতির ওপর রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, কাত'ঈ দলীল, তথা কুরআনে কারীম ও মুতাওয়াতির কিংবা মাশহূর হাদীস দিয়ে সাব্যস্ত হলে হারাম হওয়া, আর দলীলে 'যান্নী' বা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত হলে সেটা মাকরূহে তাহরীমী হওয়া— এ নীতি অন্যান্য ইমামগণ গ্রহণ করেননি। তাঁরা সহীহ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত হলেও অকাট্য হতে পারে এবং সেটার দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার কথা বলে থাকেন। অনুরূপভাবে তাঁরা মনে করে থাকেন, কুরআনুল কারীম এবং মুতাওয়াতির ও মাশহূর হাদীস দ্বারাও অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হলেও প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে; কেননা তাঁরা মনে করেন 'কাত'য়ীউস সুবূত' বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলেও 'যান্নিউদ দালালাহ' তথা– দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে। আবার 'যান্নিউস সুবূত' বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হলেও 'কাত'য়ীউদ দালালাহ' তথা– দ্ব্যর্থহীন হতে পারে। সুতরাং এ বিষয়টি বুঝা খুবই প্রয়োজন; কেননা এর ওপর ফিক্‌হের অধিকাংশ মাসআলায় হানাফী ও অন্যান্য ইমামদের মতপার্থক্যের মূল কারণ নিহিত।

---

১০৪. আল-হার্‌রানী, আব্দুস্‌সালাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ***আল মুহার্‌রার ফী-ল ফিক্‌হি 'আলা মাযহাবিল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'রিফ; ১৯৮৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৯৭।

মাকরূহ এবং খিলাফে আউলা

উসূলবিদ ও ফকীহগণ অনেক সময় 'খিলাফে আউলা' বা উত্তম রীতিপরিপন্থি, কিংবা অনুত্তম পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। কখনো 'মাকরূহ'-এর সমার্থক হিসাবে, আবার কখনো এক ধরনের 'মাকরূহ' হিসাবে।[১০৫] এর সংজ্ঞায় বলা যায়, শরী'য়াতে পছন্দনীয় বা মুস্তাহাব কোনোকিছু ত্যাগ করা, যা বর্জন করলে শরী'য়াতে নির্দিষ্ট আকারের কোনো নিষেধাজ্ঞা ও নিন্দা নাই। যেমন : 'সালাতুদ দোহা' ত্যাগ করা অনুত্তম, এজন্য নয় যে এগুলো ত্যাগ করলে শরী'য়াতে কোনো ধরনের নিষেধ আছে, কিংবা নিন্দনীয়। তবে শরী'য়াতের যেকোনো পর্যায়ের নির্দেশনা থাকার অর্থ হচ্ছে সেটা পরিহার করা নিষেধ; হোক সেই নিষেধ আবশ্যিকভাবে কিংবা অনাবশ্যিকভাবে। মাকরূহ এবং খিলাফে আউলা উভয় ধরনের কাজ করার চেয়ে পরিহার করা উত্তম। তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, যা পরিহার করার জন্য শরী'য়াতে নির্দিষ্টভাবে অনাবশ্যিক নির্দেশনা আছে তা মাকরূহ; আর যদি নির্দিষ্টভাবে নির্দেশনা না থাকে; কিন্তু বর্জনকাম্য তাহলে তা খিলাফে আউলা বা অনুত্তম। আরেকটা পার্থক্য করা যায় এভাবে, মাকরূহ হচ্ছে মানদূবের বিপরীত, অর্থাৎ মানদূব উপেক্ষা করা মাকরূহ। আর খিলাফে আউলা হচ্ছে মুস্তাহাবের বিপরীত, অর্থাৎ মুস্তাহাব উপেক্ষা করা খিলাফে আউলা।[১০৬]

আবার আল্লামা ইবন আবেদীন আশ-শামী আল-হানাফী [১১৯৮-১২৫২ হি.] 'খিলাফে আউলা'কে মাকরূহ তানযীহী থেকে বৃহৎ মনে করেন; কেননা প্রত্যেক মাকরূহ খিলাফে আউলা, কিন্তু প্রত্যেক খিলাফে আউলা মাকরূহ নয়। যেমন : মুস্তাহাব উপেক্ষা করা সবসময় খিলাফে আউলা হয়, কিন্তু মাকরূহ হয় না। কেবল মাকরূহ হওয়ার দলীল পাওয়া গেলেই মাকরূহ হয়।[১০৭]

---

১০৫. আয-যারকাশী, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্‌হ***, খ. ১, পৃ. ৪০০; আল-আনসারী, ***গায়াতুল উসূল ফী লুব্বিল উসূল***, পৃ. ১১।

১০৬. আস্‌-সুবকী, ***আল-ইবহাজ***, খ. ১, পৃ. ৫৯; আল-মারদাওয়ী, আলাউদ্দীন, ***আত-তাহ্‌বীর শারহুত তাহরীর***, খ. ৩, পৃ. ১০১০; ইবনু নাজ্জার, তাকিউদ্দীন, ***শারহুল কাউকাবিল মুনীর*** (রিয়াদ : মাকতাবাতুল 'ওবাইকান, ২য় প্র. ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪২০; ইবনু 'আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন, ***রদ্দুল মুহতার 'আলা-দদুর্‌রিল মুখতার***, (রিয়াদ : দারু আ'লমিল কুতুব, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৪২৪।

১০৭. ইবনু 'আবেদীন, ***রদ্দুল মুহতার 'আলা-দদুর্‌রিল মুখতার***, খ. ২, পৃ. ৪২৪।

অতএব, খিলাফে আউলা মাকরূহ তানযীহীর একটা প্রকার; তবে মানগত দিক দিয়ে একটু নিচু। তবে ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'মাকরূহ' ও 'খিলাফে আউলা' উভয়টি পরিহার করা প্রশংসনীয় কাজ এবং এতে আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিল হয়; কারণ শরী'য়াতের যেকোনো পর্যায়ের নির্দেশনা থাকার অর্থ হচ্ছে সেটা পালন করার হলে পালন করা এবং সেটা পরিহার করার হলে বর্জন করা। সেটা আবশ্যিকভাবে হোক কিংবা অনাবশ্যিকভাবে।[১০৮]

তবে সব পর্যায়ের সকল ফকীহগণ 'খিলাফে আউলা' কিংবা 'তারকুল আউলা' অথবা এর সমার্থক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এবং তাঁরা প্রায়শ এর প্রয়োগ করেছেন এমন বিষয়ে, যা তুলনামূলক পালন করার চেয়ে বর্জন করা উত্তম। ফলে আমার কাছে এটি এক ধরনের মাকরূহ বা মাকরূহ-এর এক প্রকার বলে প্রতিয়মান হয়েছে। যদিও এতদুভয়ের মাঝে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান, যা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। কেননা মানদূবের যেমন বিভিন্ন স্তর আছে অনুরূপভাবে মাকরূহেরও স্তর রয়েছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাকরূহ বিষয়ে কতিপয় লক্ষণীয় বিষয়

১. কুরআন-সুন্নাহতে মাকরূহ কখনো হারাম অর্থেও ব্যাবহার হয়েছে; কারণ হারাম আল্লাহর কাছে অবশ্যই অপছন্দনীয়, সে অর্থে।[১০৯] যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا﴾

'এসবের মধ্যে যেগুলো মন্দকাজ, সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়।'[১১০]

এখানে মন্দকাজসমূহ যা মূলত হারাম সেগুলোকে অপছন্দনীয় বলা হয়েছে অথচ এগুলো স্পষ্ট হারাম। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

«إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ»

[১০৮] আয্-যারকাশী, বদরুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ, *তাশ্নীফুল মাসামি' বি-জাম্য়ি'ল জাওয়ামি'* (কায়রো : মাকতাবাতু কুরতুবা, ১ম প্র.; ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬১; আল-আনসারী, যাকারিয়া ইবনু মুহাম্মাদ, *গায়াতুল উসূল ফী লুব্বিল উসূল*, পৃ. ১১।

[১০৯] ইবনু কাইয়্যিম আল-জাউযিয়্যাহ, *'ইলামুল মুওয়াক্কে'ঈন*, খ. ১, পৃ. ৩২; আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন, *আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ*, খ. ১, পৃ. ৩৯৩।

[১১০] আল-কুরআন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা) : ৩৮।

'আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অবকাশ দেওয়া কাজগুলো কার্যকরী হওয়া পছন্দ করেন। যেমন : তিনি তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করেন।'[১১১]

২. জমহুর তথা ইমাম মালেক (রাহ.), শাফি'য়ী (রাহ.) ও আহমদ (রাহ.) কখনো মাকরূহকে হারাম অর্থেও ব্যবহার করেছেন। যেমন : মালেকী ফকীহ মুহাম্মদ আল-হাত্তাব (রাহ.) [মৃ. ৯৫৪ হি.] বলেন,

ইমাম মালেক অনেক সময় তাঁর নিকট খাঁটি হারাম বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেও তিনি 'অপছন্দ করেন' বলতেন।[১১২] অনুরূপভাবে ইমাম শাফি'য়ী অনেক সময় হারামের স্থলে মাকরূহ ব্যবহার করতেন। যেমন : মৃত ব্যক্তির জন্য বেশি হাহু-তাস ও হাহাকার করা অপছন্দনীয় বলেছেন অথচ উনার মাযহাবে তা হারাম।[১১৩] তেমনিভাবে ইমাম আহমদ বলেন, স্বর্ণের পাত্রে ওযু করা অপছন্দনীয়, অথচ এটা তার মাযহাবে হারাম।[১১৪]

অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ, তিনিও কখনো কখনো প্রকাশ্য হারাম কাজকে মাকরূহ বলেছেন। যেমন : তিনি বলেছেন, 'আমি অপছন্দ করি দো'য়াকারীর জন্য এটা বলা, 'হে আল্লাহ্! আপনার কাছে অমুকের অধিকারের মাধ্যমে চাচ্ছি...।'[১১৫]

তা ছাড়া ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর *ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন* গ্রন্থে একটি অধ্যায় বিন্যাস করেছেন, যাতে এটা প্রমাণ করেছেন যে, সালাফগণ 'আকরাহু' বা 'মাকরূহ মনে করি' বলে হারাম বুঝাতেন।[১১৬]

৩. মাকরূহ হচ্ছে হারামের খাদেম, যেমনইভাবে মানদূব হচ্ছে ফরযের খাদেম এবং মাকরূহ হারাম রাজ্যের তোরণ। কেননা মাকরূহ হয়তো হারামের ভূমিকা নয়তো পরিপূরক অথবা স্মরণস্বরূপ[১১৭] তাই মাকরূহ মানেই বৈধ মনে করা চরম বোকামি হবে।

[১১১] ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৫৮৬৬; ইমাম ইবনু হিব্বান, **সহীহ ইবন হিব্বান**, হাদীস নং-৩৫৪। হাদীসটি সহীহ।

[১১২] আল হাত্তাব, শামছুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মালিকী, *মাওয়াহিবুল জালিল ফী-শারহি মুখতাসারিল খলীল* (বৈরূত : দারুল ফিক্র-১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৯।

[১১৩] ইমাম শাফি'য়ী, মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস, *আল-উম্ম* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩১৮।

[১১৪] ইবনু কাইয়্যিম আল-জাউযিয়্যাহ, *'ইলামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ. ১, পৃ. ৩২।

[১১৫] ইবনু আবিল ইয্ আল-হানাফী, *শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ*, (বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, তাহকীক: শু'য়াইব আল-আরনাউত, ১০ম প্র., ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৯৭।

[১১৬] ইবনুল কাইয়্যিম, *'ইলামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ. ১, পৃ. ৩২।

[১১৭] আশ-শাতিবী, ইব্রাহীম ইবনু মূসা, *আল-মুওয়াফাকাত্* (দারু ইবন আফ্ফান, ১ম প্র.; ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৩৯, অভিযোজিত।

পাঁচ. মুবাহ (المباح) বৈধ

মুবাহ-এর আভিধানিক অর্থ

মুবাহ শব্দটি আরবী, যার অর্থ অনুমোদিত, বৈধ, প্রশস্ত, উভয় দিক সমান। মূলত مباح (মুবাহ) بوح (বু-হুন) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। এটা দ্বারা কোনোকিছুর প্রশস্ততাকে বুঝায়। যেমন বলা হয়ে থাকে باحة الدار (বা-হাতুদ দা-রি) অর্থাৎ ঘরের আঙিনা; প্রশস্ত হওয়ার কারণে। আর এটা সংকীর্ণতার বিপরীত। বলা হয় أَبَاحَ الشَّيْءَ (আবাহা-শ্‌শাইয়া) যখন কোনোকিছুকে বৈধতা দেওয়া হয়, হালাল করা হয়, অনুমোদন দেওয়া হয়, প্রকাশ করা হয়।'[১১৮]

মুবাহ (المباح)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ

'মুবাহ' বলতে বোঝানো হয় এমন কাজ, যা করা অথবা না করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা মুকাল্লাফ বান্দাকে ইখতিয়ার প্রদান করেছেন। এগুলো করার কারণে কোনো প্রশংসা বা সাওয়াব নেই আবার বর্জন করলেও কোনো নিন্দা বা শাস্তি নেই। অর্থাৎ করা বা না করা উভয়টি সমান।[১১৯]

অন্য সংজ্ঞায় এসেছে : যে কর্মের সঙ্গে সত্তাগতভাবে কোনো আদেশ কিংবা নিষেধ সম্পৃক্ত থাকে না। এ সংজ্ঞাতে 'সত্তাগতভাবে' কথাটি এজন্য বলা হয়েছে; যেহেতু হতে পারে এর সঙ্গে তৃতীয় কোনো বিষয় সম্পৃক্তের ফলে সেটাকে নির্দেশিত অথবা নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত করবে। আর 'মুবাহ'কে 'হালাল' বা 'জায়েয'ও বলা হয়ে থাকে।[১২০]

মুবাহ চিহ্নিত হওয়ার শব্দ বা সীগাহসমূহ

ইসলামী আইনে অনেকভাবে মুবাহ চিহ্নিত হতে পারে। যথা—

---

১১৮. আর-রাযী, ***মুখতারুস সিহাহ***, পৃ. ৪১; ইবনু মানযূর, ***লিসানুল 'আরাব***, খ. ২, পৃ. ৪১৬; আল-আমেদী, আবুল হাসান, ***আল-ইহ্কাম ফী-উসূলিল আহ্কাম*** (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ১২৩।

১১৯. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১০৯; আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ৪৬।

১২০. আয-যারকাশী, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ***, খ. ১, পৃ. ৩৬৪-৩৬৬; ইবনু কুদামাহ, মুয়াফ্ফাক উদ্দীন, ***রওযাতুন নাযের*** (কায়রো : মুয়াস্সাসাতুর রাইয়্যান, ২য় প্র.; ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৮-১২৯; আল-'উসাইমিন, মুহাম্মদ ইবনু সালেহ, ***আল-উসূল মিন 'ইলমিল উসূল***, পৃ. ১২।

১. حِلٌّ (হিল্লুন) বা হালাল শব্দ এবং এর ব্যুৎপন্ন রূপান্তরিত শব্দের মাধ্যমে সুস্পষ্ট মুবাহ চিহ্নিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾

'আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল।'[১২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস,

«في البحر حين سألوه عنه : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমুদ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল।'[১২২]

২. গুনাহ নেই, দোষ নেই, সমস্যা নেই অথবা এর সমার্থক শব্দসমূহ দ্বারাও মুবাহ চিহ্নিত হয়। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾

'অন্ধের জন্য কোনো দোষ নেই। পঙ্গুর জন্য কোনো দোষ নেই, রোগাক্রান্তের জন্য কোনো দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও কোনো দোষ নেই যে, তোমরা খাবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা

---

১২১. আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়েদা) : ৫।

১২২. ইমাম আবূ দাউদ, ***সুনানু আবি-দাউদ***, হাদীস নং-৮৩; ইমাম তিরমিযী, ***সুনানুত- তিরমিযী***, হাদীস নং-৬৯। শু'য়াইব আল-আরনাওউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি তোমাদের হাতে, অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে।'[১২৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

'অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানি ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে (তা করে), তার জন্য কোনো পাপ নেই।'[১২৪]

যেমন হাদীসে এসেছে,

«عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مُطعِمٍ قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ، فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف، فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح»

'আবুল মিনহাল আব্দুর রহমান ইবন মুত'ইম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা ইবনু 'আযেব রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এবং যায়েদ ইবন আরকাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে 'সারফ' বা নগদ মানি এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ব্যবসায়ী ছিলাম। তখন আমরা তাঁকে সোনা-রুপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি নগদ হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই; যদি বাকিতে হয় তাহলে বৈধ নয়।'[১২৫]

৩. কোনোকিছু নিষেধ করার পরে আদেশ দেওয়া। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾

১২৩. আল-কুরআন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ৬১।

১২৪. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৭৩।

১২৫. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-২০৬০।

'যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহ্র অনুগ্রহকে অনুসন্ধান কর।'[১২৬]

এখানে জুমার আযানের পর বেচাকেনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ জুমার দিকে দ্রুত ছুটে যায়। যখন জুমার সালাত আদায় শেষ হয়ে যাবে তখন কেনা-বেচা তার পূর্ববর্তী অবস্থার দিকে আসবে। আর এ বৈধ অবস্থায় ফিরে আসাটা, চাওয়া হয়েছে নিষেধের পরে আদেশের সীগাহ দ্বারা।

৪. যে কাজ ফরয, ওয়াজিব, মানদূব, হারাম অথবা মাকরূহ নয়, সেগুলো 'মুবাহ' হিসাবে চিহ্নিত হবে। কারণ, শরী'য়াতে প্রত্যেক জিনিসই মূলত বৈধ। যতক্ষণ না তা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলীল পাওয়া যায়। অথবা অন্য কোনো হুকুম ধারণ করার প্রমাণ না পাওয়া যায়। সুতরাং যে কোনো বস্তুকে ফরয, ওয়াজিব, মানদূব, হারাম বা মাকরূহ বলার জন্য দলীল প্রয়োজন; আর দলীল পাওয়া না গেলে জিনিসটা বৈধ এবং জায়েয। এটাকে বলে 'আল-ইবাহা আল-আসলিয়্যাহ' (الإباحةُ الأَصْلِيَّةُ) প্রত্যেক জিনিসের মূলে বৈধ। আর এটা একটি ফিক্হী মূলনীতি বা 'কা'য়িদা' : "الأصل في الأشياء الإباحة" (আল-আসলু ফিল আশইয়ায়ি আল-ইবাহাতু)-এর অন্তর্ভুক্ত।[১২৭]

মুবাহ কি অন্য হুকুম ধারণ করতে পারে?

মুবাহ জিনিসের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তবে যেহেতু মুবাহ জিনিসটি করা বা বর্জন করা উভয়ের সমান সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে যেকোনো এক দিকে ঝুঁকে যাওয়া সম্ভব। সুতরাং নিয়ম হলো প্রত্যেক মুবাহ জিনিসের হুকুম বা বিধান বৈধই বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ মুবাহ যতক্ষণ পর্যন্ত বৈধতার বিশেষণে বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর কোনো সাওয়াব কিংবা শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু মুবাহে কল্যাণের সাইড অথবা অকল্যাণের সাইড যেকোনো একটি প্রাধান্য পেতে পারে। যদি কল্যাণের দিকটি প্রাধান্য পায় তাহলে জিনিসটি মানদূব বা ওয়াজিব হবে। আর যদি অকল্যাণের পাল্লা ভারী হয় তাহলে মুবাহ জিনিসটি মাকরূহ বা হারামে পরিণত হবে। সুতরাং প্রত্যেক বৈধ জিনিস তৃতীয় কোনো বিষয়

১২৬. আল-কুরআন, ৬২ (সূরা আল-জুমু'আহ) : ১০।

১২৭. আয-যারকাশী, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ***, খ. ১, পৃ. ৩৬৭; খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১০৯; আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ৪৬।

সম্পৃক্ত হওয়ার দরুন সেটা মুবাহের বিধান থেকে অন্য নতুন নির্দেশিত কিংবা নিষিদ্ধ বিধানে পরিণত হতে পারে। যেমন–

১. সমস্ত পবিত্র জিনিস খাওয়া এবং পান করা মুবাহ বা বৈধ। কিন্তু, উভয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ করা মাকরূহ, অপচয় করা হারাম। দলীল: মহান আল্লাহ্‌র বাণী,

﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟﴾

'তোমরা খাও এবং পান করো কিন্তু অপচয় করবে না।'[১২৮]

২. সুস্পষ্ট অবৈধ কোনোকিছু না থাকলে খেলাধুলা মুবাহ। কিন্তু, যদি সেটা ফরয বিধান বাদ যাওয়ার কিংবা অন্য কোনো হারামের কারণ হয়। যেমন : খেলার কারণে সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া, অথবা কোনো হারাম কাজের মাধ্যম হওয়া, যেমন অন্যের প্রতি আক্রমণ করা ইত্যাদি; তাহলে সেটা হারাম হবে।

৩. পানি ক্রয় করা একটি মুবাহ কাজ। কিন্তু, পানি ক্রয়ের ওপর যদি ফরয সালাতের জন্য ওযু করা নির্ভর করে, তাহলে পানি ক্রয় করা ওয়াজিব। কেননা স্বীকৃত নিয়ম হচ্ছে—'যে মাধ্যম ব্যতীত কোনো ওয়াজিব কাজ সম্পন্ন হয় না সে মাধ্যমও ওয়াজিব' (مالايتم الواجب الا به فهو واجب)।

৪. সফরের সময় সাওম রাখা মুবাহ, ইচ্ছে করলে রাখবে কিংবা রাখবে না। আনাস ইবন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সফর করতাম, তখন কেউ সাওম রাখলেও কাউকে তিরস্কার করতেন না। কিন্তু সফরে সাওম রাখাটা যদি মুসাফিরের জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে তখন সাওম ভঙ্গ করা তার জন্য ওয়াজিব।[১২৯]

খ) আল-হুক্‌মুল ওয়াদ্ব'ঈ (الحكم الوضعي)

আল-হুক্‌মুল ওয়াদ্ব'ঈ এর পরিচয়

আল-হুক্‌মুল ওয়াদ্ব'ঈ বা প্রতীক-বিধান হচ্ছে, যেটা শরী'য়াত প্রণেতা একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিসের জন্য কারণ/উপলক্ষ্য বা 'সাবাব' (سبب)

১২৮. আল-কুরআন, ৭ (সূরা আ'রাফ) : ৩১।

১২৯. আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৫০।

কিংবা শর্ত (شرط) অথবা প্রতিবন্ধক/অন্তরায় বা মানে' (مانع) হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।[১৩০]

অন্য আরেক সংজ্ঞায়,

'যাকে শরী'য়াত প্রণেতা কোনোকিছু সাব্যস্ত হওয়া কিংবা না হওয়া অথবা কোনোকিছু বাস্তবায়িত হওয়া কিংবা না হওয়ার আলামত বা প্রতীক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তাকে আল-হুকমুল ওয়াদ্ব'ঈ বা প্রতীক-বিধান বলে।'[১৩১] যেমন : সালাত ফরয হওয়ার জন্য ওয়াক্ত হওয়া 'সাবাব' বা কারণ। সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওযু শর্ত, ধর্ম ভিন্ন হওয়া বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য মানি' বা অন্তরায়।

হুক্‌মে তাক্‌লীফী ও হুক্‌মে ওয়াদ্ব'ঈ-এর মধ্যে পার্থক্য

১. আল-হুক্‌মুত তাক্‌লীফী বা দায়িত্বমূলক বিধান 'মুকাল্লাফ' তথা সাবালক, সুস্থ ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে আল-হুক্‌মুল ওয়াদ্ব'ঈ বা প্রতিক-বিধান ছোট-বড়, সুস্থ ও পাগল সব ধরনের মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার কখনো কখনো মানুষ ছাড়া অন্যকিছুর সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

২. আল-হুক্‌মুত তাকলীফী কার্যকর করার ক্ষমতা সাধারণত মুকাল্লাফের এখতিয়ারে থাকে। যেমন : সালাত ও সাওমসংক্রান্ত আদেশ, উভয়ই আদায় করা না করার সামর্থ্য বান্দার মধ্যে রয়েছে। পক্ষান্তরে আল-হুক্‌মুল ওয়াদ্ব'ঈ শরী'য়াত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত। কখনো কখনো বান্দার ক্ষমতার বাইরে থাকে। যেমন : সালাত ফরয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত হওয়া 'সাবাব' বা কারণ, অথবা সালাত ফরয হওয়ার জন্য সাবালক হওয়া শর্ত, যাতে বান্দার কোনো ক্ষমতা বা হাত নেই বরং শরী'য়াত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত। আবার কখনো বান্দার সামর্থ্যের মধ্যে থাকে। যেমন : ক্রয় করার চুক্তি করা মালিক হওয়ার কারণ, কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হত্যার বদলে হত্যা বা 'কিসাস' দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ তেমনইভাবে যত অপরাধ শাস্তির কারণ হয় সবগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।[১৩২]

১৩০. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৯৯; আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৫২।

১৩১. আল-'উসাইমিন, মুহাম্মদ ইবনু সালেহ, ***আল-উসূল মিন 'ইলমিল উসূল***, পৃ. ১৩।

১৩২. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৯৯-১০০; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজিয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ২৯৭।

আল-হুকমুল ওয়াদ্ব'ঈ-এর প্রকারভেদ–

১. সাবাব (سبب) কারণ/উপলক্ষ্য

২. শর্ত (شرط)

৩. মানি' (مانع) প্রতিবন্ধক/অন্তরায়

৪. সহীহ (صحيح) শুদ্ধ

৫. বাতিল (باطل) অশুদ্ধ

৬. আযীমত (العزيمة) দৃঢ়।

৭. রুখসাত (الرخصة) ছাড়।

এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো-

এক. সাবাব (سبب)-এর পরিচয়

শাব্দিক অর্থ : কারণ, উপলক্ষ্য, হেতু, উপকরণ। অর্থাৎ যেটা একটি জিনিসকে অন্য জিনিসের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।

পারিভাষিক অর্থ : সাবাব হচ্ছে এমন গুণ বিশেষ, যার উপস্থিতিকে শরী'য়াত অন্য একটি হুকুমের উপস্থিতির জন্য চিহ্ন বা আলামত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং এটার অনুপস্থিতিকে অন্য একটি হুকুমের অবিদ্যমানতার জন্য চিহ্ন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ বিধানটি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এর উপস্থিতি জরুরী এবং এর অনুপস্থিতির অর্থ হবে বিধানটি অনুপস্থিত।[১৩৩]

সাবাব ও 'ইল্লাতের মধ্যে পার্থক্য

'ইল্লাত বলা হয়, যা পাওয়া গেলে হুকুমটি সাব্যস্ত হয়। আর পাওয়া না গেলে হুকুমটিও পাওয়া যায় না। যদিও বিধানের বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা নির্ভর করার বিবেচনায় 'সাবাব' ও 'ইল্লাত' উভয়টির মধ্যে সাদৃশ্য আছে; কিন্তু উসূলবিদদের মতে, দুটির মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য রয়েছে—

১. যদি সাবাব বা কারণটি যৌক্তিক (معقول المعنى) হয়, অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা যেটাকে বিধানের জন্য যথার্থ যুক্তিসংগত কারণ হিসাবে গ্রহণ

১৩৩. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১১১-১১২; আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ৫৩।

করে নেয়। তখন কারণটিকে 'ইল্লাত' (علة) বলা হয়, যেমনইভাবে সাবাব বলা হয়। যেমন : মদ হারাম হওয়ার যথার্থ কারণ হলো নেশা। যেহেতু মদ্যপানের মাধ্যমে বুদ্ধি-বিবেক লোপ পায়, সেহেতু সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা মদ হারাম হওয়ার এ কারণকে যথার্থ যুক্তিসংগত কারণ হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং এটিকে 'ইল্লাত বলা হবে, তেমনইভাবে 'সাবাব' বলা হবে।

২. আর যদি বুদ্ধি-বিবেচনায় কারণটি অযৌক্তিক, অসংগত (غير معقول المعنى) মনে হয়, তাহলে সেটাকে শুধুই 'সাবাব' (سبب) বলা হয়, 'ইল্লাত' বলা হয় না। যেমন : যোহরের সালাত ফরয হওয়ার কারণ হচ্ছে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়া। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনায় বিধানের সঙ্গে এ কারণের কোনো যথার্থ সংগতি নির্ধারণ করা যায় না। কারণ, পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়া বা না পড়ার সঙ্গে সালাত ফরয হওয়ার কারণ ও সম্পর্ক স্পষ্ট নয়। সুতরাং এটিকে শুধু 'সাবাব' বলা যাবে, 'ইল্লাত বলা যাবে না। এ ভিত্তিতে প্রত্যেক 'ইল্লাতই সাবাব; কিন্তু প্রত্যেক 'সাবাব' 'ইল্লাত নয়। ফলে 'সাবাব' 'ইল্লাতের চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক।[১৩৪]

সাবাব-এর প্রকারভেদ

সাবাব (سبب) দুই প্রকার।[১৩৫] যথা–

(ক) এমন সাবাব বা কারণ যেটাকে শরী'য়াত শুরুতেই সাবাব হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যেখানে বান্দার কোনো হাত থাকে না বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যেমন–

- যোহরের সালাত ফরয হওয়ার জন্য সূর্য হেলে যাওয়াটা 'সাবাব' বা কারণ। যেমন : মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾

'সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে সালাত কায়েম কর।'[১৩৬]

১৩৪. আন-নাম্লাহ, আব্দুল করীম ইবনু আলী, ***আল-মুহায্যাব ফী উসূলিল ফিক্হিল মুকারন***, খ. ১, পৃ. ৪০১।

১৩৫. আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ৫৪।

১৩৬. আল-কুরআন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা) : ৭৮

○ রমযানের সাওম ফরয হওয়ার জন্য রমাদ্বান মাস আসা 'সাবাব' বা কারণ। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলা বাণী,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

'তোমাদের মধ্যে যে রমাদ্বান মাস পাবে সে যেন সাওম পালন করে।'[১৩৭]

○ মৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া জায়েয হওয়ার জন্য অনোন্যপায় বা বাধ্য হওয়া 'সাবাব' বা কারণ। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

'যে নিরুপায় অথচ নাফরমান এবং সিমালঙ্ঘনকারী নয় (হয়ে তা করবে) তার কোনো পাপ হবে না।'[১৩৮]

○ রমাদ্বানের সাময়িকভাবে সাওম পালন না করা বৈধ হওয়ার জন্য অসুস্থতা 'সাবাব' বা কারণ। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

'তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে, অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।'[১৩৯]

এগুলো এমন 'সাবাব' যেগুলো মুকাল্লিফের ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।

(খ) এমন 'সাবাব' যা বান্দার সামর্থ্যের মধ্যে থাকে এবং শরী'য়াত এই সাবাবের উপস্থিতির কারণে বিধান দিয়ে থাকেন। উদাহরণ—

○ রমাদ্বানের সাময়িক সাওম পালন না করা বৈধ হওয়ার জন্য সফরও একটা 'সাবাব' বা কারণ। যেমন : মহান আল্লাহ্ তা'আলা সাওম সম্পর্কিত আয়াতে বলেন,

﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

'তোমাদের মধ্যে কেউ সফরে থাকলে, অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।'[১৪০]

১৩৭. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৮৫।
১৩৮. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৭৩।
১৩৯. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৮৪।

○ ব্যভিচারের শাস্তি বাস্তবায়ন করার জন্য যিনা 'সাবাব' বা কারণ। যেমন– মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে ১০০ বেত্রাঘাত করবে।'[১৪১]

○ ইচ্ছাকৃত খুন করা খুনের বদলে খুন 'কিসাস' দণ্ডের 'সাবাব' বা কারণ, এগুলো এমন সাবাব যা বান্দার ক্ষমতার মধ্যে থাকে এবং এ কারণগুলো পাওয়া গেলে তখনই কেবল শাস্তি বাস্তবায়ন হয়।

দুই. শর্ত (الشرط)

শাব্দিক অর্থ : চিহ্ন, আলামত, লক্ষণ, প্রতীক।

পারিভাষিক অর্থ : শর্ত বলা হয়, যার অনুপস্থিতি শর্তযুক্ত জিনিসের অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে। কিন্তু তার উপস্থিতি শর্তযুক্ত জিনিসের উপস্থিতিকে অবধারিত করে না। অর্থাৎ শর্ত এমন বিষয়, যার বিদ্যমানতার ওপর আরেকটি জিনিসের বিদ্যমানতা নির্ভর করে। কিন্তু তা উক্ত বিষয়ের ভেতরের বা অভ্যন্তরীণ কোনোকিছু নয়, বরং বাইরের বিষয়।[১৪২]

উদাহরণ—সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওযু করা শর্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কুনই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা

১৪০. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৮৪।
১৪১. আল-কুরআন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ২।
১৪২. আন-নাম্লাহ, *আল-মুহায্যাব ফী উসূলিল ফিক্হিল মুকারন*, খ. ১, পৃ. ৪৩৩; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজিয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ৬৯।

মাছেহ কর এবং পদযুগল গিটসহ ধৌত কর। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও।'[১৪৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا تقبل صلاة بغير طهور»

'পবিত্রতা ব্যতীত কোনো সালাত কবুল হয় না।'[১৪৪]

সুতরাং সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওযু করা শর্ত। কোনো ব্যক্তি যদি ওযু ছাড়া সালাত আদায় করে, তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে না। কিন্তু ওযু সালাতের কোনো অভ্যন্তরীণ অংশ বা উপাদান নয়। তাই ওযু করলেই যে, সালাত পাওয়া যাবে, এমন নয়; আর এই জন্যই ওযু করার পর সালাত পড়া বাধ্যতামূলক নয়।

শর্ত এবং রুকন-এর মধ্যে পার্থক্য

শর্ত এবং রুকন (الركن)-এর মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে যে, উভয়টির ওপর আরেকটি জিনিসের উপস্থিতি নির্ভরশীল। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে— শর্ত হলো যেকোনো বস্তুর বাইরের বিষয়, মূলের কোনো অংশ বা উপাদান নয়, বরং সম্পূরক বিষয়। অন্যদিকে রুকন হলো কোনো জিনিসের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং মূল উপাদান। যেমন : ওযু করা সালাতের জন্য শর্ত এবং সাজদাহ সালাতের জন্য রুকন। কিন্তু সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয়ের উপস্থিতি আবশ্যক। তবে পার্থক্য হলো, ওযু মূলত সালাতের অংশ নয় এবং সালাতের সম্পূরক ও বাইরের বিষয়। কিন্তু সাজদাহ মূলত সালাতেরই একটা মূল উপাদান এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়।[১৪৫]

শর্ত (الشرط)-এর প্রকারভেদ

শর্ত দুই প্রকার। যথা—

(ক) শর্ত শর'য়ী (شرط شرعي) বা আইনগত শর্ত

শর্ত শর'য়ী হচ্ছে : যেটাকে শরী'য়াত শর্ত হিসাবে নির্ধারণ করেছে। যেমন : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত।

---

১৪৩. আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়েদা) : ৬।

১৪৪. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং- ২২৪।

১৪৫. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজিয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৪০৪।

(খ) শর্ত জা'লী (شرط جعلي) বা তৈরিকৃত শর্ত

শর্ত জা'লী হচ্ছে : এমন শর্ত যেটা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের লেনদেনের মধ্যে নির্ধারণ করে থাকে, কিন্তু ইবাদতের মধ্যে নয়। যেমন : বিভিন্ন চুক্তিতে মানুষ যেসব শর্ত দিয়ে থাকে।

শর্ত জা'লী বা তৈরিকৃত শর্ত আবার দুই প্রকার। যথা—

১. শর্ত সহীহ বা বিশুদ্ধ শর্ত (شرط صحيح) মানব রচিত শর্তসমূহের মধ্যে যেটা শরী'য়াতের কোনো দলীলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, সেটাই বিশুদ্ধ শর্ত।

   উদাহরণ—বিক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের শর্তে ক্রেতার নিকট কোনো জিনিস বিক্রি করা।

২. শর্ত বাতিল (شرط باطل) বাতিল শর্ত হচ্ছে, মানবরচিত শর্তসমূহের মধ্যে যেটা শরী'য়াতের কোনো দলীলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, সেটাই বাতিল শর্ত।[১৪৬]

তিন. মানে' (المانع)

মানে'-এর শাব্দিক অর্থ : প্রতিবন্ধক, বাধা, অন্তরায়, অর্গল। কাজে বা সিদ্ধান্তে যা বাধা তৈরি করে।

মানে'-এর পারিভাষিক অর্থ : মানে' বলতে বোঝানো হয়, যার উপস্থিতির কারণে শরী'য়াত সংশ্লিষ্ট জিনিসটাকে বাতিল করে। অর্থাৎ যা পাওয়া গেলে বিধান সাব্যস্ত হয় না।[১৪৭]

মানে'-এর প্রকারভেদ

মানে' দুই প্রকার। যথা–

(ক) মানে' লিল-হুকুম (مانع للحكم) বা হুকুমের জন্য বাধা

এমন প্রতিবন্ধক যার উপস্থিতির কারণে কোনো সাব্যস্ত হওয়া হুকুম সরাসরি বাতিল হয়ে যায়। এমনকি সাবাব ও শর্ত উভয় বিদ্যমান থাকার পরও। উদাহরণ–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী,

---

১৪৬. আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৫৭।

১৪৭. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ১১৪; আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৫৯।

«لا يقتل والد بولده»

'কোনো পিতা যদি তার সন্তানকে হত্যা করে তার বদলে কিসাস হিসাবে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।'[১৪৮]

সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মতে, এখানে শরী'য়াত পিতৃত্বটাকে কিসাস বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধক বানিয়েছে। যখন কোনো পিতা তার সন্তানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাহলে এই হত্যার বদলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না, যদিও এখানে কিসাসের সাবাব তথা- খুন এবং শর্ত ইচ্ছাকৃত খুন, উভয়টাই উপস্থিত। তাকে অবশ্য অন্যভাবে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।[১৪৯]

(খ) মানে' লিস-সাবাব (مانع للسبب) বা কোনো কারণের জন্য বাধা

কোনো সাবাবের উপস্থিতির কারণে শরী'য়াত কোনো একটি বিধান নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু মানে'-এর উপস্থিতির ফলে শরী'য়াত কর্তৃক প্রণীত বিধান এবং সাবাব উভয়ই বাদ যাবে। উদাহরণ—কোনো ব্যক্তি যদি যাকাতযোগ্য কোনো সম্পদ বা টাকাপয়সা জমা করে এবং উক্ত সম্পদ তার অধীনে পূর্ণ এক বছর থাকে, তখন এই সম্পত্তির কারণে উক্ত ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয়। কিন্তু এই সম্পদ যদি ঋণ পরিশোধ করার জন্য হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করতে হবে না; কেননা এখানে ঋণ, যাকাতের সাবাব অর্থাৎ নির্দিষ্ট সম্পদের মালিক হওয়ার মানে' বা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঋণী ব্যক্তি ঋণের কারণে যেন সে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির মালিকই হয়নি। ফলে যাকাত দেওয়ার জন্য তার আদৌ কোনো সম্পদ রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয় না। এভাবে যখন মানে'-এর কারণে সাবাব বাতিল হয়ে যায় তখন যাকাত আদায়ের হুকুম ফরযও বাদ হয়ে যায়।[১৫০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«لا صدقة إلا عن ظَهر غِنيً»

অর্থাৎ 'ধনী বা ধনাঢ্যতা ছাড়া সাদকা নেই।'[১৫১]

---

[১৪৮] ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৩৪৬, ইমাম ইবনু মাজাহ, হাদীস নং- ২৬৬১। হাদীসটি হাসান।

[১৪৯] সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাউসূয়াতুল-ফিক্হিয়্যাহ* (কুয়েত : ওয়াক্ফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দারুস্ সালাসিল-১৪০৪ হি.) খ. ৩২, পৃ. ৯৯; আল-জুদাই', *তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৬০।

[১৫০] আবু যাহরাহ, *উসূলুল ফিক্হ*, পৃ. ৬২-৬৩; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজিয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪১৭-৪১৮; ।

[১৫১] ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭১৫৫। হাদীসটি সহীহ।

চার. সহীহ (الصحيح)

সহীহ-এর পরিচয়

সহীহ-এর শাব্দিক অর্থ : শুদ্ধ, সত্য, বৈধ, নির্ভুল, কার্যকর, সুস্থ, সঠিক।

বান্দার কর্মসমূহের মধ্যে শরী'য়াত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসমূহ যখন পূর্ণ হয়, উপকরণগুলো পাওয়া যায়, সম্পাদনের অন্তরায়সমূহ বিদূরিত হয় এবং যথাসময়ে তা সংগঠিত হয়, তখন শরী'য়াত হুকুম দেবে যে, এই কর্মটি শুদ্ধ এবং ফলদায়ক।

শরী'য়াতের পরিভাষায় সহীহ হচ্ছে : শরী'য়াতের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন করার কারণে যে কর্মের ফলসমূহ ধার্য হয়, চাই সে কর্ম কোনো ইবাদত হোক কিংবা লেনদেন হোক।

ইবাদতের ক্ষেত্রে সহীহ হলো, যে কাজের দ্বারা ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় এবং আদেশ-নিষেধের দাবিও পূরণ হয়, ফলে শরী'য়াত মুকাল্লাফের কাছে ওই কাজের পুনরাবৃত্তি চাইবে না। যেমন : সালাতের প্রয়োজনীয় সমস্ত রুকন, শর্ত পূরণ করে, যথাসময়ে তা আদায় করা। লেনদেনের ক্ষেত্রে সহীহ হলো যে কর্মের ফল তার ওপর বর্তায়। যেমন : ক্রয়-বিক্রয়ের শরী'য়াত নির্ধারিত সমুদয় শর্ত পূরণ করে, সম্পাদনের অন্তরায় দূর করে বেচাকেনা সম্পন্ন করলেই তা সঠিক হবে। আর বৈধ বিক্রয়ই আইনগত পরিণতি প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ এর ফলাফল হিসাবে ক্রেতার জন্য মূল্যের মালিকানা স্বত্ব এবং বিক্রেতার জন্য পণ্যের মালিকানা স্বত্ব ধার্য হয়।

কোনো কাজই শর্ত, সাবাব পূরণ এবং অন্তরায় দূর করা ছাড়া সহীহ হিসাবে গণ্য হবে না। অতএব, যদি কোনো কাজের মধ্যে কোনো শর্ত পাওয়া না যায় কিংবা কোনো প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যায়, তাহলে কাজটি সহীহ হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন : ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত অনুপস্থিতির উদাহরণ হলো, পবিত্রতা ছাড়া সালাত পড়া। কেননা, সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এমন বস্তু বিক্রয় করা যার সে মালিক নয়। কেননা, বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মালিক হওয়া।

ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যাওয়ার উদাহরণ হচ্ছে, ঈদের দিন সাওম রাখা। চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যাওয়ার উদাহরণ হলো, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে বিয়ে করা।[১৫২]

পাঁচ. বাতিল (الباطل)

বাতিল-এর পরিচয়

বাতিলের শাব্দিক অর্থ : অকার্যকর, অশুদ্ধ, অলীক, নষ্ট, অবৈধ।

বান্দার কোনো কর্মে যদি শরী'য়াত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসমূহ অথবা রুকনসমূহ থেকে কোনো একটি অপূর্ণ থাকে, অথবা ত্রুটিযুক্ত হয়, কিংবা প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যায়, তাহলে শরী'য়াত সেটাকে বাতিল বলে।

বাতিলের পারিভাষিক অর্থ : শরী'য়াতের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন না করার কারণে যে কর্মের ফলসমূহ ধার্য হয় না, বা কর্মের ফল তার ওপর বর্তায় না। চাই সেটা ইবাদত হোক কিংবা মুয়ামালাত বা লেনদেন অথবা চুক্তি।

ইবাদতের ক্ষেত্রে বাতিল হলো, যে কাজ দ্বারা ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হয় না এবং দাবিও পূরণ হয় না, ফলে শরী'য়াত মুকাল্লাফের কাছে ওই কাজের পুনরাবৃত্তি চাইবে। যেমন : ওযু ছাড়া সালাত আদায় করা।

লেনদেন অথবা চুক্তির ক্ষেত্রে বাতিল হলো যার কর্মের ফল তার ওপর বর্তায় না। যেমন, এমন বস্তু বিক্রি করা যার মালিক সে নয়।[১৫৩] ফলে এই বিক্রয় আইনগত পরিণতি প্রদান করতে পারে না।

বাতিল এবং ফাসিদ-এর মধ্যে পার্থক্য

যখন কোনো কর্মের শরী'য়াত নির্ধারিত অত্যাবশ্যকীয় রুকনগুলো, শর্তসমূহ পূর্ণ হয় এবং তা সম্পাদনের প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত হয়, তখন তাকে সহীহ বা শুদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়। অন্যথায় তা বাতিল বলে গণ্য হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, ফলাফলের দিক দিয়ে কোনো কাজ হয়তো সহীহ বা শুদ্ধ হবে অথবা অশুদ্ধ বা বাতিল হবে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী কোনো শ্রেণি নেই, চাই সেটা ইবাদত হোক অথবা লেনদেন হোক। কিন্তু হানাফীগণ সহীহ ও বাতিলের মধ্যবর্তী একটি শ্রেণি ভাগ করেছেন, তা হলো ফাসিদ।

[১৫২] আল-'উসাইমিন, মুহাম্মদ ইবনু সালেহ, *আল-উসূল মিন 'ইলমিল উসূল*, পৃ. ১৩; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজিয ফী-উসূলিল ফিক্বহিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪১৬।

[১৫৩] প্রাগুক্ত; আবু যাহরাহ, *উসূলুল ফিক্বহ*, পৃ. ৬৪-৬৫।

ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, (باطل) এবং ফাসিদ (فاسد) একই অর্থবোধক, এ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যা বাতিল তাই ফাসিদ। হানাফী ইমামগণও ইবাদতের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের অনুরূপ বাতিল (باطل) এবং ফাসিদ (فاسد)-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। তবে লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁরা এতদুভয়ের মধ্যে নিম্নোক্তভাবে পার্থক্য করেছেন—

- যদি কোনো চুক্তি/লেনদনের অত্যাবশ্যকীয় রুকন অর্থাৎ মূল উপাদানে কোনো কমতি বা ত্রুটি থাকে তাহলে সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার কোনো আইনগত বৈধতা থাকে না। যেমন— পাগলের ক্রয়-বিক্রয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা পাগলের ক্রয় এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন এবং তাকে লেনদেনের অনুপযুক্ত ঘোষণা করেছেন। আর ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য চুক্তির পক্ষদ্বয়কে উপযুক্ত হতে হয়। সুতরাং পাগল যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের উপযুক্ত নয়, তাই তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে।

- যদি কোনো চুক্তি কিংবা আদান-প্রদানের মূল উপাদানে কোনো সমস্যা না থাকে, বরং আনুষঙ্গিক কোনো গুণাগুণের বিষয়ে কোনো কমতি অথবা সমস্যা থাকে। যেমন : যদি কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হয় তাহলে সেটা হবে 'ফাসিদ'। তাদের মতে, একটি ফাসিদ চুক্তিতে কোনো কোনো গুণাগুনের বিষয়ে কমতি থাকলেও তা চুক্তি হিসাবে বলবৎ থাকে এবং পুরোপুরি না হলেও কিছুটা আইনগত গুরুত্ব বহন করে। কেননা ফাসিদ হচ্ছে যা মূলত বৈধ মাশরূ' কিন্তু ওয়াসফ বা গুণের কমতি রয়েছে। আর বাতিলে মূল এবং গুণ উভয়েই কমতি থাকার কারণে অবৈধ বা 'গাইরে মাশরূ'। হানাফীগণ মনে করেন যে, কমতি হওয়া লেনদেনের গুণ বা 'ওয়াসফ'কে প্রভাবিত করে, মূল বা 'আস্‌ল'কে নয় এবং গুণের কমতি প্রায়শই সংশোধন করা যায়। যেমন— কোনো বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ ছাড়াই যদি সম্পাদন করা হয়, তাহলে এর মূল্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তেমনইভাবে চুক্তিতে এ ধরনের কোনো গুণে কমতি থাকলে তা জানার পর যত দ্রুত সম্ভব সংশোধন করা যায়। আরেকটি উদাহরণ হলো, সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ, কেননা সাক্ষী হলো বিবাহের একটি শর্ত। কিন্তু এটি বিবাহের রুকন নয়। সুতরাং বিবাহটি ফাসিদ হবে, বাতিল নয়। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরও বরকনে অথবা কাজিকে এ কমতি যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করে সংশোধন করতে হবে অন্যথা বিবাহ বাতিল হবে। বিবাহ সম্পন্ন

হওয়ার আগে এ কমতি জানা থাকলে, বিবাহ সম্পন্ন করা অবৈধ হবে। তারপরও যদি বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী দেনমোহর পাওয়ার অধিকারী হবে এবং বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর স্ত্রীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট ইদ্দত পালন করতে হবে। ফাসিদ বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করা সন্তান বৈধ হবে, কিন্তু স্ত্রী ভরণপোষণ পাবে না এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ওয়ারিশি অধিকার সাব্যস্ত হবে না।[১৫৪]

সুতরাং, সমস্ত ইমামদের মতে ইবাদত দু' প্রকার : সহীহ অথবা বাতিল। আর লেনদেনও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে দু' প্রকার সহীহ (বৈধ) অথবা বাতিল (অবৈধ)। কিন্তু হানাফীগণের মতে, (লেনদেনের ক্ষেত্রে) তিন প্রকার : সহীহ, বাতিল ও ফাসিদ।

ছয়. আযীমাত (العزيمة)

আযীমাত-এর আভিধানিক অর্থ : আযীমাত (العزيمة) আরবী শব্দ যার অর্থ দৃঢ় সংকল্প, নিশ্চিত ইচ্ছা, ধৈর্য, কোনো কাজ করতে কঠোর চেষ্টা-পরিশ্রমের নিয়ত করা, বিবেককে কোনো কাজে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত করা প্রভৃতি।[১৫৫] যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—

﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا﴾

'আর আমরা তার মধ্যে সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি।'[১৫৬]

আযীমাত-এর পারিভাষিক অর্থ : আযীমাত হচ্ছে শরী'য়াতের যেকোনো হুকুমের প্রথম অবস্থা বা মৌলিক বিধান। শরী'য়াত যা সাধারণত সকল মানুষের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য করেছে। অর্থাৎ শরী'য়াতে যা যেভাবে বলা হয়েছে হুবহু সেভাবেই পালন করা যেখানে কোনো গ্রহণযোগ্য 'উযর' বা প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান নেই। যেমন : প্রত্যেক মুকাল্লাফের জন্য

[১৫৪] আল-বুখারী, আলাউদ্দীন, *কাশফুল আসরার শারহ উসূলিল বাযদাবী* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২৫৮-২৫৯; আয-যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ*, খ. ২, পৃ. ১৫-১৬; আমীর বাদশাহ, *তাইসিরুত তাহরীর*, খ. ২, পৃ. ২৩৬; ইবনু নুজাইম, যাইনুদ্দীন ইবন ইব্রাহীম, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৯১; আবু যাহরাহ, *উসূলুল ফিক্হ*, পৃ. ৬৫-৬৮; মুহাম্মদ ইবনু সালেহ, *আল-উসূল মিন 'ইলমিল উসূল*, পৃ. ১৩।

[১৫৫] আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, পৃ. ২০৮; ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরাব*, খ. ১২, পৃ. ৩৯৯; আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনির*, খ. ২, পৃ. ৪০৮।

[১৫৬] আল-কুরআন, ২০ (সূরা ত্ব-হা) : ১১৫।

নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে ফরয সালাত আদায় করা। রমাদ্বানের সাওম রাখা। এগুলো শরী'য়াতের মূল বিধান; সুতরাং এগুলো 'আযীমাত'।[১৫৭]

আযীমাত-এর হুকুম : আযীমাত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এমন আদেশ, যা পালন করা প্রত্যেক মুকাল্লাফ তথা সুস্থ, বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক।

সাত. রুখসাত (الرخصة)

রুখসাত-এর আভিধানিক অর্থ : শিথিলতা সম্পন্ন, সহজ, সুবিধা, অবকাশ, ছাড়, নমনীয়, ব্যতিক্রমী, নিষেধের পর অনুমতি।[১৫৮]

রুখসাত-এর পারিভাষিক অর্থ : গ্রহণযোগ্য 'উযর' বা প্রতিবন্ধকতা অথবা অন্য কোনো বিশেষ পরিস্থিতির কারণে শরী'য়াত মূল বিধান শিথিল করে অন্য কোনো বিকল্প বিধান প্রদান করে, তখন তাকে রুখসাত (رخصة) বলে।

উদাহরণ—বাচ্চা ও পাগলের জন্য শরী'য়াতের বিধান প্রযোজ্য না হওয়া। অনুরূপভাবে মুসাফিরের জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাতে 'কস্‌র' বা দুই রাকাত আদায় করার অবকাশ। এ ছাড়া বৃষ্টি বা সফরের কারণে দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে পরপর আদায় করার সুযোগ। ক্ষুধায় মৃত্যু উপক্রম ব্যক্তির জন্য প্রাণ রক্ষার্থে মৃত অথবা হারাম প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি।[১৫৯]

রুখসাতের কারণসমূহ أسباب الرخص **(আসবাবুর রুখাস)**

ইসলামী শরী'য়াতে সর্বমোট সাতটি কারণে রুখসাত প্রদান করা হয়। সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো–

(ক) সৃষ্টিগত দুর্বলতা ضعف الخلق (দ্বিঅ'ফুল খালকি)। উদাহরণ—শিশু এবং পাগলের ওপর শরী'য়াতের বিধান প্রযোজ্য নয়, সৃষ্টিগত দুর্বলতার কারণে। মহিলাদের সৃষ্টিগত দুর্বলতার কারণে জুমার সালাত আদায় করা, জামাতে সালাত পড়া ওয়াজিব করা হয়নি।

[১৫৭] আবু যাহরাহ, *উসূলুল ফিক্হ*, পৃ. ৫০; আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৬২।

[১৫৮] আর-রাযী, *মুখতারুস সিহাহ*, পৃ. ১২০; ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরাব*, খ. ১২, পৃ. ৩৯৯; আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনির*, খ. ৭, পৃ. ৪০; আবু হাবীব, ড. সা'দী, *আল-কামূসুল ফিক্হী*, পৃ. ১৪৬।

[১৫৯] আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৬২-৬৩।

(খ) অসুস্থতা المرض (আল-মারাদ্ব)। উদাহরণ—অসুস্থতার কারণে রমাদ্বানের সাওম ভঙ্গ করার বৈধতা, অসুস্থতার কারণে বসে অথবা শুয়ে সালাত আদায় করার সুযোগ।

(গ) সফর বা ভ্রমণ السفر (আস-সফর)। যেমন : কেউ ৭৮ কিলোমিটার বা এর বেশি ভ্রমণের নিয়তে যদি নিজ লোকালয় অতিক্রম করে তবে সে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে। এ সময় সে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাত দুই রাকাত আদায় করবে এবং এটাকে 'কসর' বলে। তার জন্য রমাদ্বানের সাওম পরে রাখার সুযোগও আছে।

(ঘ) ভুলে যাওয়া النسيان (আন-নিসয়ান)। ভুলে যাওয়ার কারণে গুনাহ্ না হওয়া অথবা আখিরাতের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণ। যেমন : সাওম রাখা অবস্থায় ভুলে পানাহার করলেও সাওম ভঙ্গ না হওয়া।

(ঙ) অজ্ঞতা الجهل (আল-জাহল)। উদাহরণ—কেউ যদি ইসলামের বিধান সম্পর্কে যথাযথ চেষ্টা করা সত্ত্বেও জ্ঞান অর্জন করতে না পারে, এই অজ্ঞতার কারণে আখিরাতে জিজ্ঞাসিত না হওয়া। অনুরূপভাবে কোনো বস্তু ক্রয় করার পর সেটাতে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ক্রেতা সেই বস্তু ফেরত দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার কারণ।

(চ) বল প্রয়োগ الإكراه (আল-ইকরাহ)। উদাহরণ—জীবন রক্ষার্থে অথবা অসহনীয় কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য বলপ্রয়োগ করা হলে অথবা বাধ্য হলে, শরী'য়াত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ করার অনুমতি পাওয়ার কারণ।

(ছ) 'ওমূমুল বাল্ওয়া عموم البلوى এটা এমন একটি অবস্থা কিংবা বিষয়, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। এটাও ছাড় পাওয়ার কারণ। যেমন : চেষ্টার পরও কিছু প্রস্রাবের কণা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব।[১৬০]

রুখসাতের প্রকারভেদ (أنواع الرخصة)

ইসলামী শরী'য়াতের দৃষ্টিতে রুখসাত তিন প্রকার। যথা—

(ক) অতীব জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে অবৈধ বা হারাম জিনিস বৈধ হওয়া। শরী'য়াতে এটার মূলনীতি, কা'য়িদা বা ম্যাক্সিম হলো—

১৬০. আবু যাহরাহ, ***উসূলুল ফিক্‌হ***, পৃ. ৫১-৫৩; আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৬৪।

"الضرورة تبيح المحظورات."

অর্থাৎ 'অতীব প্রয়োজন অবৈধকে বৈধ করে।'[১৬১]

উদাহরণ—বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে কুফুরীর শব্দ উচ্চারণ করার অনুমতি শরী'য়াত দিয়েছে, তবে অন্তরে ঈমানে অবিচল থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

'তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফুরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।'[১৬২]

অনুরূপভাবে চরম ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য নিরুপায় হয়ে (এমন ক্ষুধা অথবা পিপাসা, সে না খেলে মারা যাবে) মৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া, শূকরের গোশত খাওয়া, তেমনইভাবে চরম পিপাসার্ত অবস্থায় অন্য কোনো পানীয় না থাকলে হারাম পানীয় পান করার অনুমতি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

'কিন্তু যে নিরূপায় অথচ নাফরমান এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয় (তা করবে) তার কোনো পাপ হবে না ।'[১৬৩] তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না।

(খ) কিছু ওয়াজিব বা ফরয পালন করা অসম্ভব হলে কিংবা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হলে, তখন এটির বিকল্প অথবা বাদ দেওয়ার মাধ্যমে রুখসাত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

'আমি যখন তোমাদের কোনোকিছুর আদেশ করি তখন তোমরা সেটা আদায় করার জন্য তোমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা কর।'[১৬৪]

১৬১. আল-বূরনু, মুহাম্মদ সিদকী ইবনু আহমদ, ***মাউসূয়াতুল কাওয়ায়িদিল ফিক্‌হিয়্যাহ*** (বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৬৩।

১৬২. আল-কুরআন, ১৬ (সূরা আন-নাহল) : ১০৬।

১৬৩. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৭৩।

১৬৪. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৭২৮৮; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ্ মুসলিম***, হাদীস নং-১৩৩৭।

উদাহরণ—সালাতে কিয়াম করা ফরয হওয়া সত্ত্বেও অক্ষমতার কারণে কিয়াম ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি এবং বসে সালাত আদায়ের সুযোগ, বসেও সালাত পড়তে না পারলে পিঠের ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে সালাত আদায় করার মাধ্যমে রুখসাত।

দলীল : ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো। যদি দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে না পারো তাহলে বসে সালাত পড়ো, বসে সালাত পড়তে না পারলে পিঠের ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে সালাত পড়।[১৬৫]

এবং অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য রমাদ্বানের সাওম না রাখা এবং পরবর্তী সময়ে কাযা দেওয়া বৈধ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

'তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।'[১৬৬]

(গ) মানুষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে, মানুষের কষ্ট দূর করা ও সুবিধার জন্য অবৈধ হওয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও কিছু লেনদেন কিংবা চুক্তি বৈধতা প্রদান করার মাধ্যমে রুখসাত।

উদাহরণ—অগ্রিম বিক্রয় বা 'বাইয়ু সালাম'-এর অনুমতি প্রদান করা।

দলীল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ»

'যে ব্যক্তি অগ্রিম বিক্রয় বা 'বাইয়ু সালাম' করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ, পরিমাপ এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত করে।'[১৬৭]

তেমনইভাবে ভবিষ্যতে নির্মাণযোগ্য পণ্যের ('আকদুল ইস্তিসনা') জন্য অর্ডার দেওয়ার অনুমতি। এগুলোতে চুক্তির সময় পণ্যের অস্তিত্ব না থাকার কারণে মূলত অবৈধ হওয়ার কথা। কিন্তু মানুষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে, মানুষের

১৬৫. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-১১১৭।
১৬৬. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৮৫।
১৬৭. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-২২৪০।

কষ্ট দূর করার জন্য ব্যতিক্রমীভাবে রুখসাত হিসাবে শরী'য়াত এগুলোর বৈধতা দিয়েছে।

(ঘ) অনেকের মতে, পূর্বের আসমানী শরী'য়াতে আরোপিত কতিপয় কঠিন কাজ থেকে মুসলিম উম্মাহকে রুখসাত হিসাবে ইসলামী শরী'য়াতে তা থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়েছে। যেমন : সম্পদের এক-চতুর্থাংশ যাকাত হিসাবে প্রদান করা।[১৬৮]

রুখসাত গ্রহণ করার হুকুম ও স্তরসমূহ

রুখসাত গ্রহণ করার হুকুম সবসময় একইরকম নয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'য়াতে নিম্নোক্ত চারটি স্তর রয়েছে।[১৬৯]

(ক) ঐচ্ছিক

রুখসাত গ্রহণ করা অথবা রুখসাত গ্রহণ না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। বান্দা চাইলে রুখসাত গ্রহণ নাও করতে পারবে।

উদাহরণ—সফরের সময় যদি কষ্ট না হয় স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন রমাদ্বানের সাওম না রাখার রুখসাত গ্রহণ করা অথবা না করার স্বাধীনতা রয়েছে। বান্দা ইচ্ছা করলে সাওম রাখতে পারবে ইচ্ছা করলে সাওম না রাখতে পারবে।

দলীল : হামযা ইবন 'আমর আল-আসলামী রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি কি সফরে রমাদ্বানের সাওম রাখব? আর তিনি প্রচুর সাওম রাখতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, যদি তুমি চাও তাহলে তুমি সাওম রাখতে পারো আর ইচ্ছা করলে সাওম না রাখতে পারো।[১৭০]

(খ) রুখসাত গ্রহণ করা উত্তম

যেমন—সফরের সময় চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাতে দুই রাকাত আদায় করা। এ ধরনের রুখসাত গ্রহণ করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

১৬৮. আবু যাহরাহ, ***উসূলুল ফিক্‌হ***, পৃ. ৫৩-৫৪; আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৬৫।
১৬৯. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৪৩৬।
১৭০. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং- ১৯৪৩; ও ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং- ১০৩। (إن شئت فصُم، وإنْ شئت فأفطر).

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই তাঁর সকল সফরে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাত দুই রাকাত আদায় করেছেন। এমন কোনো সহীহ বর্ণনা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো সফরে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয সালাতে পূর্ণ চার রাকাতই আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধারাবাহিকভাবে সর্বদা এই রুখসাত গ্রহণ করাটা উত্তম হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

তাই জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে, সফরের সময় কসর করা সুন্নাত। হানাফী মাযহাবে এই রুখসত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

(গ) রুখসাত গ্রহণ না করা উত্তম

উদাহরণ—কোনো ব্যক্তি অসহনীয় কষ্টের কারণে বাধ্য হয়ে কুফুরী শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে তার রুখসাত বা অনুমতি রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে এই রুখসাত গ্রহণ করতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে সে এ রুখসাত গ্রহণ নাও করতে পারবে। তবে সে যদি রুখসাত গ্রহণ না করে। অর্থাৎ বাধ্য হওয়ার পরেও মুখে কুফুরী শব্দ উচ্চারণ না করে এবং ধৈর্যধারণ করে, এটা তার জন্য উত্তম। আর এটা ছিল অসংখ্য নবী-রাসূল এবং তাদের অনুসারীদের অবস্থা।

(ঘ) রুখসাত গ্রহণ করা ফরয

উদাহরণ—যদি কোনো ব্যক্তি অতীব ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত খেতে বাধ্য হয় এবং মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ না করলে সে মারা যাবে, তাহলে তার জন্য শরী'য়াত এটি গ্রহণ করার অনুমতি বা রুখসাত দিয়েছে এবং তার জন্য এই রুখসাত গ্রহণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, তাকে মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত খেয়ে জীবন বাঁচানো ফরয।[১৭১]

দলীলঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

'তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়াবান।'[১৭২]

---

[১৭১] আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৪৩৬। আল-জুদাই', ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৬৬।

[১৭২] আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসাঃ ২৯)।

রুখসাত গ্রহণ করা কি উচিত?

শর'য়ী রুখসাতসমূহ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ শরী'য়াত মুকাল্লাফের জন্য যেসব ক্ষেত্রে রুখসাত বা বিশেষ শিথিলতা দিয়েছে যেগুলো সাব্যস্ত এবং প্রমাণিত, সেগুলো গ্রহণ করা সুন্নাত। সেখানে আযীমাত বা মূল বিধানকে হুবহু ধরে রাখা উচিত নয়, বরং রুখসাত গ্রহণ করাই সমীচীন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেছেন,

«إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه»

'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আযীমাতসমূহ বা স্বাভাবিক মূল বিধানগুলো কার্যকর হওয়া যেমন পছন্দ করেন। তেমনই তিনি তাঁর রুখসাতসমূহ বা বিশেষ ছাড় ও সুবিধাগুলো কার্যকর হওয়াও পছন্দ করেন।'[১৭৩]

সুতরাং আল্লাহ্ যে কাজকে পছন্দ করেন তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এগুলোকে মাকরূহ বলা দূরের কথা, অনুত্তম বা সমীচীন নয় বলার অবকাশও রাখে না। উক্ত হাদীসে রুখসাত গ্রহণ করাকে অপছন্দ করে বিরত থাকাটা অপছন্দনীয় ও মাকরূহ প্রমাণ হয়, আরেক হাদীসে তা আরও স্পষ্টভাবে এসেছে—

«عن عائشةَ رضي الله قالتْ: صنعَ رسول الله – ﷺ – أمرًا فترخَّص فيه، فبلغَ ذلكَ ناسًا من أصحابهِ فكأنَّهُم كرهُوهُ وتنزَّهوا عنهُ، فبلغَه ذلكَ فقامَ خطيبًا فقالَ: «ما بالُ رِجالٍ بلغَهُم عنِّي أمرٌ ترخَّصتُ فيهِ فكرِهوهُ وتنزَّهُوا عنهُ، فوالله لأنا أعلمُهم بالله وأشدُّهُمْ لهُ خشيَةً»

'আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করলেন এবং এটি ছাড় হিসাবে জারি রাখলেন। এ খবর তাঁর কিছু সাহাবীর কাছে পৌছলে তারা এ কাজটি পছন্দ করলেন না এবং তা থেকে বিরত রইলেন। এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন—জনগণের কী হলো, তাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, একটা কাজে আমি ছাড় এবং সম্মতি দিয়েছি তারপরও তারা একে নিকৃষ্ট মনে করছে এবং এ থেকে বিরত থাকছে!

---

[১৭৩] ইমাম ইবনু হিব্বান, ***সহীহ ইবনু হিব্বান***, হাদীস নং- ৩৫৪. হাদীসটি সহীহ।

আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি জানি এবং আল্লাহ্কে তাদের তুলনায় অত্যধিক ভয় করি।'[১৭৪]

ইমাম ইবনু হাজার [৭৭৩-৮৫২ হি.] রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে,

'শরী'য়াতে যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় রয়েছে, সেখানে মূল বিধান আঁকড়ে ধরা একরকম বাড়াবাড়ি।'[১৭৫]

রুখসাত তালাশ করে অনুসরণ করা (تتبع الرخص)

রুখসাত দুই ধরনের হয়ে থাকে, প্রথমত : শর'য়ী রুখসাত যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত এবং যাকে পারিভাষিক রুখসাত বলা হয়। এই ধরনের রুখসাত গ্রহণ করার আলোচনা ইতোমধ্যে হয়েছে। দ্বিতীয়ত : রূপক অর্থে রুখসাত, অর্থাৎ—বিভিন্ন মাযহাব থেকে সুবিধাজনক ও সহজতর মত বেছে বেছে গ্রহণ করা। রুখসাত তালাশ বা (تتبع الرخص) দ্বারা এই দ্বিতীয় প্রকারই উদ্দেশ্য। এর সংজ্ঞায় উসূলবিদগণ বলেন—

'ব্যক্তির জন্য পালন করতে অধিকতর সহজ হয় সেরকম মতামত প্রত্যেক মাযহাব থেকে বাছাই করে গ্রহণ করা।'[১৭৬]

মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদী মতামতের মধ্যে কিছু না কিছু সহজ, সুবিধাজনক ও মেনে চলা তুলনামূলক অনায়াসযোগ্য বিষয়াদি রয়েছে। ফলে প্রত্যেক মাযহাবেই এমন কিছু মতামত পাওয়া যায়, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের সম্মিলিত মতামতের বিপরীত। এমন অবস্থায় যদি কোনো মুকাল্লাফ প্রত্যেক মাযহাব থেকে ইচ্ছে অনুযায়ী শুধু সহজ রুখসাতসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করে এবং তদনুসারে আমল করে, তার হুকুম কী? এ প্রসঙ্গে একাধিক মত রয়েছে। যথা–

(ক) সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, মুকাল্লিদদের জন্য ইচ্ছে অনুযায়ী, সুবিধামতো, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বিভিন্ন মাযহাবের কেবল সহজতর বিষয়গুলো আমল করা অবৈধ, বরং ইমাম ইবন হায্ম [৩৮৪-৪৬৫ হি.] ও ইবনু আব্দিল বার্ আল-মালিকী [৩৬৮-৪৬৩ হি.] (রাহ.) এরূপ কাজ মোটের ওপর ফাসিকী ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা'ও বর্ণনা করেছেন।[১৭৭]

অনেক ইমামের মতে, এটাই 'তালফীক'[১৭৮] বা মুজতাহিদদের রুখসাত, বিরল ছাড় ও পদস্খলন হিসাবে চিহ্নিত মতামতগুলো তালাশ করে আমল করা। এরূপ করা জঘন্য অপরাধ ও হারাম বলে বিশ্বস্ত ইমামগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন; বরং তাঁদের অনেকেই এ ব্যাপারে আরও কঠিন মন্তব্য করেছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ—

- সুলাইমান আত-তায়মী (রাহ.) [মৃ. ১৪৩ হি.] বলেন—যদি তুমি সকল আলিমের ছাড়গুলো গ্রহণ করো, তাহলে তোমার মধ্যে সকল নিকৃষ্ট কাজগুলোর সমাবেশ ঘটবে।[১৭৯]
- ইব্রাহীম ইবন আবি উলাইয়্যা (রাহ.) [মৃ. ১৫২ হি.] বলেন—যে ব্যক্তি শুধুই ইলমের ব্যতিক্রমধর্মীর অনুসরণ করবে সে বিপথগামী।[১৮০]
- ইমাম আওযা'য়ী (রাহ.) [মৃ. ১৫৭ হি.] বলেন—যে ব্যক্তি আলিমদের 'নাওয়াদের' বা বিরল মতামতসমূহ অনুসরণ করবে, সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।[১৮১]
- কাযী ইসমাঈল ইবন ইসহাক (রাহ.) [মৃ. ২৮২ হি.] বলেন—"প্রত্যেক আলিমেরই কিছু না কিছু 'যাল্লাত' বা পদস্খলনজনিত শায

---

১৭৪. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং- ১০৩।

১৭৫. আল-আসকালানী, ***ফতহুল বারী*** (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.) খ. ১, পৃ. ৯৪। মূল ইবারত : (فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع)

১৭৬. আয-যারকাশী, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ***, খ. ৮, পৃ. ৩৮১; আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনু আলী, ***ইরশাদুল ফুহুল***, খ. ২, পৃ. ২৫৩। (اختيار من كل مذهب ما هو الأهون عليه) অথবা (اختيار المقلد من كل مذهب ما هو الأهون عليه والأخف له).

১৭৭. আয-যারকাশী, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ***, খ. ৮, পৃ. ৩৮২; আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনু আলী, ***ইরশাদুল ফুহুল***, খ. ২, পৃ. ২৫৩।

১৭৮. **'তালফীক'**: শব্দের অর্থ মিশ্রণ করা, একত্র করা। পারিভাষিক অর্থে 'তালফীক' বলা হয়– কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এমন একটি ধরন তৈরি করা, যা পূর্ববর্তী কোনো মুজতাহিদ বলেননি। অর্থাৎ কোনো একটি বিষয়ে দুই বা ততোধিক মাযহাবের মতামত একত্রিকরণে নিজের ইচ্ছামতো এমন মতামত তৈরি করা, যা কোনো মাযহাব কিংবা মুজতাহিদের সঙ্গে মেলে না। কারও মতে, তালফীক হলো বিভিন্ন ইমামদের রুখসাত ও সহজতর বিষয়গুলো সুবিধামতো একত্রিত করা। (আয-যুহাইলী, ড. ওয়াহবাহ, ***আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু***, (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ৪র্থ প্র.) খ. ১, পৃ. ১০৬।

১৭৯. আল- মালিকী, ইবনু আব্দিল বার, ***জামি'উ বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাদলিহি*** (সৌদি আরব: দারু ইবনিল জাওযি, ১ম প্র. ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯২৭।

১৮০. আয-যাহাবী, শামছুদ্দীন, ***সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*** (বৈরূত : মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্র. ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১২৫।

১৮১. আত-তুয়াইজরী, আব্দুল-লতীফ ইবনু আব্দুল্লাহ, ***তাতাব্বু'উর-রুখাস বাইনাশ-শার'য়ি ওয়া-ল ওয়াকি'য়ি*** (রিয়াদ : মাজাল্লাতুল বায়ান, ১ম প্র. ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩২।

মত আছে। কাজেই যে ব্যক্তি আলিমদের বিচ্ছিন্ন মতামতগুলো সংকলন করে সেগুলো অনুসরণ করতে থাকে, তার দ্বীনই নষ্ট হয়ে গেছে।[১৮২]

এ প্রসঙ্গে ইমামদের এ ধরনের আরও অনেক উক্তি আছে, যার সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে—এভাবে বিভিন্ন মাযহাব ও ইমামদের ব্যতিক্রমধর্মী ও অধিকতর সুবিধাজনক, সহজতর বিষয়গুলো বেছে বেছে আমল করতে থাকলে এক পর্যায়ে সে তার মন যা চায় তাই করতে প্রবৃত্ত হবে। নাফসের কুমন্ত্রণা ও শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়ে হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ সবকিছুতে শরী'য়ার পরিবর্তে তার মন-মর্জির চাহিদার ওপর নির্ভর করবে এবং প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে; ফলে এক সময় মুকাল্লিদ দ্বীন থেকেও বের হয়ে যাবে। এ কারণে এরূপ কাজকে আলিমগণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলেছেন।[১৮৩]

(খ) যদি প্রবৃত্তিতাড়িত না হয়ে নির্মোহভাবে বিভিন্ন বিষয়ে নানা মাযহাবের মুজতাহিদদের ফাতওয়াসমূহ থেকে সহজতর মতামতগুলো গ্রহণ করে তাহলে নিম্নোক্ত শর্তে তা বৈধ—

১. সহজ মতামতগুলো শরী'য়াতসম্মত হতে হবে এবং ব্যতিক্রমধর্মী হিসাবে চিহ্নিত না হতে হবে।

২. সহজতর বিষয় গ্রহণ করার সামগ্রিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজন দেখা দেওয়া, কিংবা সংকট ও ঝঞ্ঝাট দূর করার লক্ষ্যে হতে হবে।

৩. এই সহজতর বিষয় গ্রহণ করার কারণে, নিষিদ্ধ 'তালফীক'-এর অনুসরণ না হতে হবে।

৪. এই রুখসাত তালাশ এমন কোনো বিষয় গ্রহণ করার মাধ্যম কিংবা কৌশল না হওয়া যা শরী'য়াতসম্মত নয়।[১৮৪]

বিশিষ্ট আধুনিক ফিক্‌হ গবেষক ড. ওয়াহ্‌বাহ আয-যুহাইলী এ প্রসঙ্গে বলেন–

---

১৮২. আয-যাহাবী, ***সিয়ারু আ'লামিন নুবালা***, খ. ১৩, পৃ. ৪৬৫; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ২, পৃ. ৩৭৫।

১৮৩. আন-নাওয়াওয়ী, ইয়াহয়া ইবনু শরফ, ***আল-মাজমু'উ শারহুল মুহাযযাব***, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৫৫; আস-সুবকী, তাজুদ্দীন, ***জাম'উল জাওয়ামি'*** (কায়রো : মাতবা'তু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী-১৩৯৬ হি.) খ. ২, পৃ. ৪০০-৪০১; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ২, পৃ. ৩৭৫।

১৮৪. কারারাতু মাজমা'য়িল ফিক্‌হিল ইসলামী, মাজাল্লাতু মাজমা'য়িল ফিক্‌হিল ইসলামী, ওআইসি, সংখ্যা-৮, খ. ১, পৃ. ৪১; আত-তুয়াইজরী, ***তাতাব্বু'উর-রুখাস বাইনাশ-শার'য়ি ওয়া-ল ওয়াকি'য়ি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

'আমি মনে করি যে, গ্রহণযোগ্য মত হলো—নিজের নিতান্ত প্রয়োজনে কিংবা সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে রুখসাত তালাশের ইচ্ছাকৃত চিন্তা না থাকলে অথবা শরী'য়াত নিয়ে অনর্থক ছিনিমিনি খেলার উদ্দেশ্য না থাকলে এবং তা নিষিদ্ধ 'তালফীক'-এর পর্যায়ে না পৌঁছলে, তখন রুখসাতগুলো তালাশ করা জায়িয। কেননা, রুখসাত তালাশ করা বাস্তবিক পক্ষে ঘটছেই, যা থেকে ফাতওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুত রেহাই পাওয়া অসম্ভব।'[১৮৫]

তা ছাড়া, অনেক হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইসলামী শরী'য়াত মানা সহজ। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহজ বিষয়গুলো গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন : 'আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে দুটি কাজের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ প্রদান করা হতো, তখন তিনি সহজটিই বেছে নিতেন, যতক্ষণ না সেটা গুনাহ্‌র কাজ হতো। যদি সেটা গুনাহর কাজ হতো তাহলে তিনি তা থেকে বহুদূরে থাকতেন।'[১৮৬]

আরেক হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অনেক আমল করা পছন্দ করতেন এবং সে আমল এ আশঙ্কায় ছেড়ে দিতেন যে, সে আমল লোকেরা করতে থাকবে, ফলে তাদের ওপর তা ফরয হয়ে যাবে। তিনি তাদের জন্য ফরযসমূহ কম হওয়া পছন্দ করতেন।[১৮৭]

(গ) কারো কারো মতে, ইমামগণের বিরোধপূর্ণ মাসয়ালাসমূহে মুকাল্লিদ তার জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনার আলোকে অধিক শক্তিশালী দলীল সম্বলিত কিংবা জনকল্যাণ নিহিত মতটি বেছে গ্রহণ করতে পারবে অথবা সমসাময়িক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কিংবা কোনো বিষয়ে শর'য়ী বিধিবিধান জানার প্রয়োজন হলে সে নিজের চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেকের আলোকে কোনো অধিক জ্ঞানী, বিজ্ঞ,

---

১৮৫. লেখকবৃন্দ, **মাজাল্লাতু মাজমা'য়িল ফিক্‌হিল ইসলামী**, ওআইসি, খ. ৮, পৃ. ৩২; আহমদ ইয্‌য ইনায়াহ, ***আর-রুখাস আল-ফিক্‌হিয়্যাহ ফি যাওয়িল কিতাবি ওয়াস-সুন্নাহ*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৮০।

১৮৬. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং- ৬৭৮৬; ও ইমাম মুসলিম সহীহুল মুসলিম, হাদীস নং- ৫৯৪২।

(عن عائشة، قالت: ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار ايسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما، كان أبعد الناس منه)

১৮৭. ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, ***আল-মুসনাদ***, হাদীস নং- ২৪০৫৬. হাদীসটি সহীহ।

(عن عائشة، قالت: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خُفِّفَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَائِضِ)

মুত্তাকী বিদ্বানের দলীলসম্মত মতটি বেছে নিতে পারবে এবং এটা নিষিদ্ধ 'তালফীক'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১৮৮]

আদা, ই'য়াদাহ ও কাযা

হুকমে শর'য়ীর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং ইবাদত নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করা কিংবা পরে করা প্রসঙ্গে উসূলবিদগণ এই তিনটি পরিভাষা আলোচনা করেন।

(ক) আদা

সংখ্যাগরিষ্ঠ জমহুর উসূলবিদদের মতে 'আদা' বলতে বোঝানো হয় কোনো ইবাদত তার শরী'য়াত নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথমবারেই সম্পাদন করা। চাই তা ফরয হোক কিংবা মানদূব। যেমন : যেকোনো ফরয ও সুন্নাত সালাত তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবারে সম্পন্ন করা। এ ভিত্তিতে শরী'য়াতে যেসব কর্মের সময় নির্ধারিত নেই, সেসব কর্মের বেলায় 'আদা' কিংবা 'কাযা' প্রযোজ্য নয়। তবে হানাফী মাযহাবে 'আদা' বলতে বোঝানো হয়, যেকোনো শরী'য়াতসম্মত কাজ যথারীতি মূল নিয়মে সম্পন্ন করা অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের শর্তযুক্ত করেননি, যেন শরী'য়াতে যেসব কাজের সময় নির্ধারিত নেই তাও 'আদার' অন্তর্ভুক্ত হয়।

(খ) ই'য়াদাহ

'ই'য়াদাহ' বলতে বোঝানো হয় কোনো ইবাদত তার শরী'য়াত নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথমবার সম্পাদনে মৌলিক কোনো ত্রুটি হওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার সম্পন্ন করা। যেমন : ফজরের সালাতে কোনো মৌলিক ত্রুটির কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে পুনরায় সম্পন্ন করা। এ ভিত্তিতে 'ই'য়াদাহ' 'আদা'-এর একটি প্রকার। প্রত্যেক 'ই'য়াদাহ' 'আদা' কিন্তু প্রত্যেক 'আদা' 'ই'য়াদাহ' নয়।

(গ) কাযা

জমহুরের মতে, কাযা বলতে বোঝানো হয় কোনো ইবাদত তার শরী'য়াত নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের পর সম্পাদন করা। চাই তা শরী'য়াতসম্মত 'উযরের কারণে হোক অথবা 'উযর' ছাড়া হোক। যেমন : অসুস্থতার কারণে বাদ যাওয়া সাওম পরে সম্পাদন করা। ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলে কোনো সালাত তার নির্ধারিত সময়ের পর সম্পাদন করা। আর 'কাযা' হলো 'আদা'-এর বিপরীত।[১৮৯]

---

১৮৮. সম্পাদনা পরিষদ, ***আল-মাউসূয়াতুল-ফিক্‌হিয়্যাহ*** , খ. ১, পৃ. ৪১; ও খ. ১৩, পৃ. ২৯৪।

১৮৯. আত্-তাফতাযানী, ***শারহুত-তালবীহ আলা-ততাওযীহ***, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৯; আন-নামলাহ, ***আল-মুহায্যাব ফী উসূলিল ফিক্‌হিল মুকারন***, খ. ১, পৃ. ৪২০-৪২২।

আল-হাকিম (الحاكم)

আল-হাকিম-এর পরিচয়

প্রকৃতপক্ষে হাকিম বা হুকুমদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। রাসূলগণ হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সংবাদবাহক কিংবা প্রচারক। তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে কখনও কোনো প্রকার বিধান প্রণয়ন করেন না। মুজতাহিদরা হলেন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত বিধানের অনুসন্ধানকারী ও ব্যাখ্যাকার। তারাও কোনো বিধানের প্রণেতা নন। অবশ্যই রূপকভাবে অনেক সময় তাদের হাকিম বলে সম্বোধন করা হয়। এ বিষয়গুলো কুরআনে সবিস্তার বিবৃত হয়েছে।[১৯০]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

'কর্তৃত্ব তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই।'[১৯১]

আরও বলেন,

﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾

'আর আল্লাহ্ই আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই।'[১৯২]

অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

'তোমরা যেই বিষয়ে মতভেদ করো না কেন উহার মিমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট।'[১৯৩]

আল্লাহ্ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

---

১৯০. আল-জুদাই', ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৭১।

১৯১. আল-কুরআন, ৬ (সূরা আল-আন'আম) : ৫৭।

১৯২. আল-কুরআন, ১৩ (সূরা আর-রা'দ) : ৪১।

১৯৩. আল-কুরআন, ৪২ (সূরা আশ-শূরা) : ১০।

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾

'নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আর আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিবর্তনকারী হবেন না।'(১৯৪)

আরও বলেন,

﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾

'অতএব, তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী আপনি ফায়সালা করুন।'(১৯৫)

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বোঝা যায় বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিধান প্রচারকারী; তাই তাঁর প্রতি অথবা মুজতাহিদ ইমামগণের প্রতি এর সম্পৃক্ততা রূপকভাবে করা হয়। কেননা তাঁরা এসব বিষয়ে গবেষণায় মত্ত থাকেন।

'আক্বল বা বোধশক্তির অবস্থান

কোনো কাজের বিধিনিষেধ আরোপ করার উপযুক্ততা আসে বোধশক্তি বা 'আক্বল-এর বিবেচনায়। 'আক্বল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম বুঝার মাধ্যম। কখনোই শুধু 'আক্বল দ্বারা শরী'য়াত প্রতিষ্ঠিত হয় না। যদি কখনো 'আক্বল-এর মাধ্যমে শরী'য়াতের কোনো বিধান প্রণয়ন পরিলক্ষিত হয়, তবে হয়তো সেটা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে হবে কিংবা হুকুম বিবর্জিত হবে। যদি আল্লাহ্র হুকুমে হয়, তবে তো কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম বিবর্জিত হলে সেটা শরী'য়াত হবে না, বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾

১৯৪. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১০৫।
১৯৫. আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়িদা) : ৪৮।

'আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অনুসারে আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে ফয়সালা করুন। তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।'(১৯৬)

আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ আলাইহিস সালামকে বলেন,

﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

'হে দাউদ, আমি আপনাকে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, আপনি লোকদের মধ্যে সুবিচার করুন এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না, কেননা এটা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে।'(১৯৭)

শুধু 'আক্বল কখনো মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে না। এজন্য মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার বিধান জানার জন্য নবীদের আগমন ও কিতাব অবতীর্ণ করা থেকে বিমুখ থেকে পারে না। উদাহরণ হিসাবে মানবজাতির সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলেছেন,

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾

'তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথ সম্পর্কে অনবহিত অতঃপর তিনি পথের দিশা দিলেন।'(১৯৮)

অন্যত্র বলেন,

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾

'আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনি বর্ণনা করছি, অহির মাধ্যমে আপনার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করে; যদিও ইতিপূর্বে আপনি ছিলেন অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।'(১৯৯)

শরী'য়াতের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে 'আক্বলকে অনির্ভরযোগ্য বিবেচনা করার কারণ হলো বাস্তবতার বহু সাক্ষ্য। বহুক্ষেত্রে 'আক্বল বিচ্যুত হয়েছে বলে

১৯৬. আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়িদা) : ৪৯।
১৯৭. আল-কুরআন, ৩৮ (সূরা সোয়াদ) : ২৬।
১৯৮. আল-কুরআন, ৯৩ (সূরা আদ-দুহা) : ৭।
১৯৯. আল-কুরআন, ১২ (সূরা ইউসুফ) : ০৩।

ইতিহাস প্রমাণ পেশ করে। তা ছাড়া সকল মানুষের 'আক্বল বা বোধশক্তি একরকম নয়। ফলে তাদের বোধশক্তির বিচারও একরকম হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

'তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে অনুধাবন করে না? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে আসত, তবে তো তারা এতে অনেক বৈপরিত্য দেখতে পেত।'[২০০]

তবে এটা সত্য যে 'আক্বল চর্চার কিছু প্রশংসিত দিক যেমন রয়েছে তেমনই নিন্দিত দিকও রয়েছে। তাই শরী'য়াতের কোনো বিধান কেবল 'আকলের ওপর নির্ভর করে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ, বৈধ-অবৈধ বলে স্বীকৃত হয় না। কোনো কিতাব কিংবা রাসূল (আলাইহিস সালাম) কোনো সম্প্রদায়ে না আসলে তারা মুকাল্লাফ বা শরী'য়াতের বিধিবিধান পালনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

'আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।'[২০১]

সুতরাং ব্যক্তি বিধিবিধান পালনের বাধ্য ছিল কি ছিল না সেটার প্রমাণ উপস্থাপিত হবে এভাবে যে, তাদের কাছে সে সংবাদ পৌছেছিল কিনা? আকলের মাধ্যমে তারা কেন বুঝে নেয়নি? এভাবে নয়।

❖ ❖ ❖

২০০. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ৮২।
২০১. আল-কুরআন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা : ১৫)।

'মাহকুম ফীহ' বা নির্দেশিত কাজ (المحكوم فيه)

'মাহকুম ফীহ'-এর পরিচয়

'মাহকুম ফীহ' হচ্ছে, শরী'য়াত প্রণেতা কর্তৃক নির্দেশিত কোনো কাজ যার মধ্যে শরয়ী বিধান রয়েছে। সহজ কথায় যে কাজ সম্পাদনের জন্য বান্দাকে আদেশ/নিষেধ দেওয়া হয়েছে তাই 'মাহকুম ফীহ'।[২০২] উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টাকে পরিষ্কার করা যাক;

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ 'তোমরা যাকাত দাও'।[২০৩] এতে প্রতীয়মান হয়, সম্পদশালীর ওপর যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। এখানে যাকাত প্রদান করাই মাহকুম ফীহ।

২. আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখো।[২০৪] ঋণের লেনদেন লিখে রাখা সুন্নাত তা আমরা এ আয়াত থেকে বুঝি। এই ঋণের কারবার লিখে রাখাটা 'মাহকুম ফীহ'।

৩. আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ 'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না।'[২০৫] এ আয়াত ঘোষণা করেছে যে, ব্যভিচার হারাম। সুতরাং ব্যভিচারের কাছেও না যাওয়ার নিষেধাজ্ঞাই হলো 'মাহকুম ফীহ'।

৪. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾

২০২. আল-জুদাই', তাইসির *'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৭৪।
২০৩. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ৪৩।
২০৪. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৮২।
২০৫. আল-কুরআন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা) : ৩২।

"হে মুমিনগণ, তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দিই তন্মেধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা তোমরা ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার ইচ্ছা তোমরা কর না।'(২০৬) সম্পদের নিকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করা মাকরূহ' এ আয়াতের পাঠোদ্ধারে আমরা তা বুঝতে পেরেছি। নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাই হলো 'মাহকুম ফীহ'।

৫. এ বিষয়ে কুরআনুল কারীম থেকে আরেকটি উদাহরণ দিয়েই শেষ করছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ﴾ 'যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে তখন তোমরা শিকার করতে পারো।'(২০৭) ইহরাম মুক্ত হয়ে শিকারের বৈধতা এ আয়াত ঘোষণা করেছে। ইহরাম মুক্ত হওয়ার পর পশু শিকারের বৈধতাই হলো 'মাহকুম ফীহ'।

নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন কখন আবশ্যক হয়

কোনো ব্যক্তির মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে 'মাহকুম ফীহ' বা নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন ওই ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।(২০৮)

১. মুকাল্লাফ বা আদিষ্ট ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি অজ্ঞাত হলে সে ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে না এবং যথাযথ চেষ্টার পরও তার জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না হলে, এজন্য তাকে নিন্দা বা শাস্তির সম্মুখীনও করা যায় না। এটা একেবারেই স্পষ্ট বিষয়।

একটা উদাহরণ দিই, সালাত বিশুদ্ধতার জন্য ওযু শর্ত এ বিষয়টা একজন ব্যক্তি জানল না। বছরের পর বছর সে ওযু ছাড়াই সালাত আদায় করল হঠাৎ একদিন জানল ওযু ছাড়া সালাত হয় না। এখন বছরের পর বছর ওযুবিহীন আদায়কৃত সালাতগুলো পুনরায় আদায় করার কোনো নির্দেশনা শরী'য়াত দেয় না। কারণ, উক্ত বিষয়ে সে এ বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। উল্লেখ্য যে ওয়াক্তে সে জেনেছে সে ওয়াক্তের সালাত ওযু সহকারেই আদায় করতে

২০৬. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৬৭।
২০৭. আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়িদা) : ২।
২০৮. আল-জুদাই', ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ৭৫।

হবে। উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে আমরা বিখ্যাত হাদীস উল্লেখ করছি—

«عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على
النبي صلى الله عليه و سلم فرد وقال «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع يصلي
كما صلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال «ارجع فصل فإنك لم تصل». ثلاثا
فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ؟ فقال «إذا قمت إلى الصلاة
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى
تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل
ذلك في صلاتك كلها».

অর্থাৎ 'সাহাবী আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করার পর এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে সালাত পড়ল। অতঃপর এসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের উত্তর দিয়ে বলল ফিরে যাও। আবার সালাত আদায় কর। কেননা তুমি তো সালাত পড়োনি। সে পুনরায় সালাত পড়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিলো। তিনি বললেন, ফিরে যাও, আবার সালাত পড়ো। কেননা তুমি তো সালাত পড়োনি (তিনবার এরূপ হলো)। সে বলল, যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আমি এর চেয়ে উত্তম তরীকায় নামায় পড়তে জানি না। তাই আমাকে শিখিয়ে দেন। তিনি বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে, অতঃপর কুরআনের যতটুকু সম্ভব ততটুকু তিলাওয়াত কর। তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকু কর। অতঃপর সোজা স্থির হয়ে দাঁড়াও। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর, এরপর ধীরস্থির হয়ে বসো, তারপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর, তোমার পুরো সালাত এভাবেই আদায় কর।'(২০৯)

এই হাদীসে প্রমাণের ক্ষেত্র হচ্ছে, উক্ত সাহাবী নিজের অজান্তেই অশুদ্ধ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করছিলেন। অবশেষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

২০৯. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৭৫৭; ***সহীহুল মুসলিম***, হাদীস নং-৭৭১।

ওয়া সাল্লাম তাকে সঠিক পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইতিপূর্বে অশুদ্ধ পদ্ধতিতে আদায়কৃত নামাজগুলো পুনরায় আদায় করার কথা বলেননি। এটাই প্রমাণবহন করে যে, অজ্ঞতার কারণে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার নিন্দা, শাস্তির সম্মুখীন হবে না। অবশ্যই এখানে একটি বিষয় নিয়ে সামান্য বিতর্ক থেকে যায়। জানার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি অজ্ঞ থাকলে তাকে কী শরী'য়াতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে নাকি ছাড় পাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

'তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস করো।'[২১০]

কোনো নির্দিষ্ট বিধান নয়, বরং এ আয়াতের ব্যাপকতায় একথা স্পষ্ট যে, জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অবহেলা করে অজ্ঞ থাকলে সে গুণাহগার ও দোষী সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অজ্ঞ ও অনৈসলামিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী অজ্ঞের মধ্যে পার্থ্যকের রেখা টেনে দিয়েছেন উসূলবিদগণ। যদিও হাদীসে অজ্ঞতার কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তবে ইসলামিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হবে এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সুতরাং কেউ ব্যভিচার করে যদি বলে যে, আমি ইসলামিক বিধান মতে এর শাস্তি জানতাম না, তাহলে তা গৃহিত হবে না বরং বিচারে তার কথা মিথ্যা হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ, পরিবেশ-পরিস্থিতি তার বক্তব্যের বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে। অবশ্যই কোনো মুসলিম যদি এমন স্থানে বেড়ে ওঠে যে, ইসলামের নাম ব্যতীত আর কোনকিছু চর্চা নেই এবং সব ধরনের চেষ্টার পরও সেখানে বিধান জিজ্ঞেস করার মতো কোনো 'আলিম' পাওয়া না যায়, সেটা ভিন্ন বিষয়।

মোদ্দাকথা হলো, পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকেই বিধান আরোপিত হবে। শুধু দেশকেন্দ্রীক নয় এবং চারপাশের সাক্ষ্যগুলো সবিশেষ গুরুত্ব পাবে এ ক্ষেত্রে। তবে নিছক অজ্ঞতা কাউকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেয় এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২১০. আল-কুরআন, ১৬ (সূরা আন-নাহল) : ৪৩।

২. আদিষ্ট ব্যক্তি উক্ত কর্ম সম্পাদনে যোগ্য হওয়া

আদিষ্ট কর্ম সম্পাদন আবশ্যক হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত বা বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির ওপর আদিষ্ট কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য থাকা। কোনোভাবেই আদিষ্ট কাজটি হচ্ছে, উক্ত কাজটি সম্পাদনের সামর্থ্য থাকা। কোনোভাবেই আদিষ্ট কাজটি ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে হবে না। ইসলামের সকল বিধিবিধান পালনীয় হওয়ার ক্ষেত্রেই এই সামর্থ্য থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে। এমন কোনো বিধিবিধান ইসলামে নেই যা পালন করা অসম্ভব। উপরোক্ত বক্তব্যের নির্জলা সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীসে।

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ، قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ، كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدِ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥] ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] " قَالَ: نَعَمْ " ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] " قَالَ: نَعَمْ " ﴿رَبَّنَا وَلَا

تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦] " قَالَ: نَعَمْ "﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ

لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦] "

قَالَ: نَعَمْ "

'হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয়, 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা-কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র এবং তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে, যা প্রকাশ কর বা গোপন রাখো, আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ের ওপর শক্তিমান।[২১১] তখন সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর নিকট এটা খুব কঠিন মনে হয় যে, অন্তরের সকল উদিত বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা হিসাব করবেন। সুতরাং দৃঢ় ঈমানের কারণে তারা শঙ্কিত ও কম্পিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদেরকে সালাত, সিয়াম, জিহাদ ও সাদাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে যা পালন করার সামর্থ্য আমাদের আছে, কিন্তু এখন যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তা পালন করার শক্তিসামর্থ্য আমাদের নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কি পূর্ববর্তী ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মতো বলতে চাও যে, 'আমরা শুনলাম তবে মানলাম না', বরং তোমরা বলো, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব, আমাদের ক্ষমা করুন। আপনার নিকটই আমরা ফিরে যাব। অতঃপর সাহাবীগণ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা মেনে নেন এবং তাদের মুখ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেখানো কথামালা উচ্চারিত হতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সামনের আয়াত নাযিল করেন, 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তারা সকলেই আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ তাঁর কিতাব এবং রাসূলগণের ওপর ঈমান এনেছেন। তারা বলেন, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো

২১১. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৮৪।

তারতম্য করি না এবং তারা বলেন আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের রব, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি আমাদের প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।'[২১২] রাবী বলেন, সাহাবাদের সকলে এ আয়াত পাঠ করলেন এবং মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, 'রাসূল ঈমান এনেছে তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিণগণও তাদের সকলেই আল্লাহ্র, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর কিতাবসমূহের এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর ঈমান এনেছে। (তারা বলে), আমরা রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করি না। এবং তারা বলেন, আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের রব, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই আর তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন।'[২১৩] যখন তারা সর্বতোভাবে আনুগত্য প্রকাশ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে নাযিল করলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা কারও ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার পক্ষে করা অসম্ভব। সে ভালো যা উপার্জন করে তা তারই এবং মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই। যখন মুসলিমরা বলে, হে আল্লাহ্, আমাদের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য আমাদের ধরবেন না; তখন আল্লাহ্ বলেন, হ্যাঁ ধরব না। মুসলিমরা আবার বলে হে আমাদের রব, আমাদের ওপর পূর্ববর্তীদের মতো কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না; আল্লাহ্ বলেন, কবুল করা হলো। তারা যখন বলে, হে আমাদের রব, আমাদের ওপর এমন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করবেন না যা পালনের শক্তিসামর্থ্য আমাদের নেই; আল্লাহ্ বলেন, হ্যাঁ। তারা আবার বলে, হে আমাদের রব, আমাদের ক্ষমা করুন, পাপসমূহ মাফ করে দেন! আমাদের ওপর দয়া করুন! আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন;[২১৪] আল্লাহ্ বলেলন, হ্যাঁ।[২১৫]

২১২. আল-কুরআন ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৮৫।
২১৩. আল-কুরআন ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৮৫।
২১৪. আল-কুরআন ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৮৬।
২১৫. ইমাম মুসলিম, **সহীহ্ মুসলিম**, হাদীস নং-১২৫।

উপরোক্ত হাদীসে বান্দার প্রতিটি দু'আর শেষে আল্লাহ্ তা'আলা হ্যাঁ বলেছেন। এই হাদীসের অন্য বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা হ্যাঁ-এর জায়গায় বলেছেন, 'ক্বাদ ফা'আলতু'[২১৬] অর্থাৎ করেছি। সুতরাং আদিষ্ট কর্ম সম্পাদন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হওয়ার জন্য বান্দার সামর্থ্য থাকতে হবে। এ সম্পর্কে উসূলবিদগণ দুটি মূলনীতি বিবৃত করেছেন–

(ক) সাধ্যাতীত কর্মের কোনো আদেশ ইসলামে নেই।

(খ) কঠিন পরিস্থিতি সহজীকরণ বয়ে আনে।[২১৭]

আদেশ পালনকারীর আলোকে নির্দেশিত কর্মের প্রকারভেদ

আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক বা গণ-অধিকার ও বান্দার হক্ক বা ব্যক্তিগত অধিকার-এর বিবেচনায় নির্দেশিত কাজগুলোকে চারভাগে ভাগ করা যায়;[২১৮]

প্রথম প্রকার : আল্লাহ্‌র হক্ক 'হাক্কুল্লাহ' বা গণ-অধিকার

এ প্রকারের হক্ক অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ্‌র হক্কের বিধান হচ্ছে, এ হক্ক রহিত করার অধিকার কারও নেই। ফলে প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির ওপর এ প্রকার হক্ক আদায় করা ফরয। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এ প্রকারের হক্ক-এর অন্তর্ভুক্ত। যথা—

ক. নির্ভেজাল ইবাদত। যেমন : ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ। এগুলো আদিষ্ট ব্যক্তির ওপর পালন করা ফরয।

খ. ব্যয়ভার সম্বলিত ইবাদত। যেমন : যাকাতুল ফিতর এটা সাদকা হিসাবে ইবাদত। অন্যদিকে দরিদ্রের প্রয়োজন পূরণার্থে ব্যক্তির ওপর তা ওয়াজিব করা হয়েছে বিধায় এটা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

গ. এমন ব্যয় যা ইবাদত বলে পরিগণিত। যেমন : উশর। জমিনে উৎপাদিত শস্যের উশর প্রদান করা ওয়াজিব, যদি উৎপাদনে কোনো প্রকার সেচের প্রয়োজন না হয়। এটা অন্যের কল্যাণের জন্য প্রদান করতে হয় বলে তাকেই ব্যয় বলা যায়, আবার যাকাতের খাতে খরচ করতে হয় বলে তাকে ইবাদত বলা যায়।

---

২১৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৬।

২১৭. আল-জুদাই', *তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৭৮।

২১৮. প্রাগুক্ত; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৮১।

ঘ. নির্ভেজাল ব্যয়। যেমন : কর। মুসলিমদের বিজিত অঞ্চল কাফিরদের দখলে দিলে ইসলামিক রাষ্ট্র সেখান থেকে কর আদায় করে। সর্বসাধারনের জন্য কল্যাণমূলক কাজেই এই অর্থ ব্যয় করা হয়। এটাকে নির্ভেজাল ব্যয় বলার কারণ, ব্যয়কারী কাফির হওয়ায় তা 'ইবাদত হিসাবে গণ্য করার কোনো সুযোগ নেই।

ঙ. নির্ভেজাল শাস্তি বা পরিপূর্ণ শাস্তি। যেমন : 'হুদুদ' বা শরী'য়াত প্রণীত নির্দিষ্ট ধরন ও পরিমানের শাস্তিসমূহ; জিনার শাস্তি, চুরির শাস্তি, মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ইত্যাদি।

চ. লঘু শাস্তি। যেমন : হত্যাকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এতে তার শরীর বা স্বাধীনতায় তো আঘাত হানে না, তাই এটা লঘু শাস্তি।

ছ. এমন শাস্তি যা ইবাদত। যেমন : 'কাফ্‌ফারা' বা ক্ষতিপূরণসমূহ, কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা, 'যিহার'[২১৯]-এর কাফফারা। অন্যায়ের কিংবা ভুলের কারণে এই বিধান আরোপিত হয় বলে তা শাস্তি বলেই পরিগণিত। অন্যদিকে গোলাম আযাদ, সাওম, মানুষকে আহার খাওয়ানোর মতো বিষয়গুলো এতে থাকায় তাই ইবাদত বলে প্রতীয়মান হয়।

জ. ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক। যেমন : গনীমতের খুমুস আদায় করা, গনীমতের সম্পদে এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক। যা কোনো ব্যক্তির মালিকানা সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

---

২১৯. **'যিহার'** আরবী শব্দ যার অর্থ নিজের স্ত্রীকে কিংবা তার কোনো অঙ্গকে নিজের মা-এর পৃষ্ঠদেশের/অঙ্গের সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করা, অথবা স্থায়ীভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ এমন কোনো মহিলার পৃষ্ঠদেশের/অঙ্গের সমতুল্য বলা। অথবা যদি কেউ বলে, আমার স্ত্রী আমার জন্য আমার মায়ের কিংবা বোনের মতো হারাম। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, মায়ের মতো স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা হারাম করা। জাহিলী যুগে এ যিহার প্রথা চালু ছিল এবং এটাকে এমন তালাক হিসাবে গণ্য করা হতো যার পর স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকত না। ইসলামী শরী'য়তে 'যিহার' সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এর দ্বারা তালাক হয় না, বরং কাফ্‌ফারা ফরয হয়। কাফ্‌ফারা পরিশোধ করা পর্যন্ত স্ত্রী সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য হারাম থাকে। কাফ্‌ফারা আদায় করার পর স্ত্রীর সঙ্গে ঘরসংসার করা বৈধ হয়ে যায়। যিহারের কাফ্‌ফারা হচ্ছে: ৬০ দিন লাগাতার সিয়াম পালন করা অথবা ৬০ জন গরীব-মিসকীনকে একদিন খাওয়ানো। (আয-যুহাইলী, ড. ওয়াহ্‌বাহ, ***আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু***, দামিশ্‌ক: দারুল ফিক্‌র, ৪র্থ প্র., খ. ৯, পৃ. ৭১২৩; মুহাম্মদ ইবনু ইব্রাহীম ও অন্যরা, ***মাওসূ'আতুল ফিক্হিল ইসলামী***, মিসর : বাইতুল আফকার আদ-দাউলিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৪৩০ হি.-২০০৯ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ১৭৩।

দ্বিতীয় প্রকার : মানুষের হক্ক বা 'হাক্কুল আব্দ'। এটা মানুষের মাঝে সম্পাদিত পারস্পরিক চুক্তি ও সন্ধিসমূহ—এটা বিশেষ হক্ক। এ হক্কের বিধান হচ্ছে– ব্যক্তি নিজেই এ প্রকার হক্ক দাবি যেমন করতে পারে তেমনই রহিতও করতে পারে। যেমন : ঋণ, দিয়াত[২২০] ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি।[২২১]

তৃতীয় প্রকার : যে কাজে আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক ও বান্দার হক্ক দুটিই পাওয়া যায়। তবে আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক অধিকতর। যেমন : হদ্দে কযফ। অর্থাৎ কারও প্রতি মিথ্যা ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি হিসাবে দোষারোপকারকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি। অশ্লীলতা ও অশোভনতার সয়লাভ থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য এই বিধান প্রণীত। তাই এটা আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক এমন ক্ষতি ব্যাপক ক্ষতি হিসাবে গণ্য। অন্যদিকে ব্যক্তি নিষ্কলুষ চরিত্র প্রমাণের মাধ্যম হিসাবে এটি বান্দার হক্ক এবং যা একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষতির চেয়ে সমাজ পর্যায়ের ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ হয়ে থাকে। আর যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক প্রাধান্য পায় সেখানে তা কার্যকর, রহিত করার অধিকার কারও থাকে না। বান্দার হক্ক প্রাধান্য পেলে বান্দা রহিত করতে পারে। যেহেতু মিথ্যা অপবাদের পরিণাম গোটা সমাজকে কলুষিত করতে পারে, তাই এটা আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক বা গণ-অধিকার এবং এ শাস্তি রহিত করার অধিকার কারও নেই।

এ প্রকারের বিধান হচ্ছে, আদিষ্ট কাজ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সম্পাদন করতে বাধ্য। ছাড় বা রহিত করার অধিকার কারও নেই।[২২২]

চতুর্থ প্রকার : যে কাজে দুই প্রকারের অধিকারের সমন্বয় ঘটেছে, তবে বান্দার হক্ক অপেক্ষাকৃত বেশি। যেমন : ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর কিসাস বা একই প্রকার বদলা। সামাজিক নিরাপত্তা ও মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা রক্ষায় ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ওপর কিসাসের বিধান এসেছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার হক্ক। তিনি বলেন,

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

২২০. দিয়াত (دية) : রক্তপণ, রক্তমূল্য, আর্থিক ক্ষতিপূরণ।

২২১. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৪৮১।

২২২. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৪৮২।

'কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।'[২২৩]

এটা সামাজিক অধিকার। তাই এটা হাক্কুল্লাহ। অন্যদিকে এটি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের অধিকার। কারণ, কিসাস কার্যকর করলে তাদের হৃদয়ে জ্বলা প্রতিশোধের স্পৃহা নির্বাপিত হয়। তাদের অন্তরের বিদ্বেষ দূর হয়। ফলে শরী'য়াত এখানে বান্দার হক্ককেই প্রবল বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। অতএব নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ইচ্ছা করলে কিসাস শাস্তি চাইতে পারবে অথবা কিসাস মাপ করে দিয়াত দাবী করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে কিসাস দিয়াত সবকিছু মাফ করে দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾

'হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে...। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ ও সততার সঙ্গে তার 'দিয়াত' আদায় করা বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ।'[২২৪]

এই প্রকারের বিধান হচ্ছে—যেহেতু বান্দার হক্ক প্রাধান্য তাই বান্দা (নিহতের আত্মীয়স্বজন) ইচ্ছা করলে তার হক্ক দাবী করতে পারে কিংবা ছেড়ে দিতে পারে।

❖ ❖ ❖

২২৩. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৭৯।

২২৪. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ১৭৮।

'মাহকুম আলাইহি' (المحكوم عليه)

মাহকুম আলাইহি-এর পরিচয়

শরী'য়াত প্রণেতা যাকে কেন্দ্র করে কোনো কাজের আদেশ/নিষেধ প্রদান করেন সে ব্যক্তিই মাহকুম আলাইহি। শরী'য়াতের পরিভাষায় তাকে (مكلف) মুকাল্লাফও বলা হয়।[২২৫] অর্থাৎ আদিষ্ট ব্যক্তি।

দায়িত্ব অর্পণ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

দুটি বিষয় পাওয়া গেলে কোনো ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়;

১. 'আক্বল, বা বিবেক-বুদ্ধি।

২. সাবালক বা বয়সের পক্বতা।[২২৬]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

'পাগল থেকে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত, বালক হতে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত থেকে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কলম (হিসাব) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।'[২২৭] কোনো কোনো হাদীসে মাজনুন-এর বদলে মা'তুহ (মানসিক বিকারগ্রস্ত) শব্দটি এসেছে।'[২২৮]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

২২৫. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্বহিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৪৮৫।

২২৬. আল-জুদাই', ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্বহ***, পৃ. ৮২।

২২৭. হাদীসটি সহীহ, ***মুসনাদে আহমাদ***, হাদীস নং-৯৪০, ৯৫৬; আবূ দাউদ, ***আস-সুনান***, হাদীস নং-৪৩৯৯, ৪৪০৩; তিরমিযী, হাদীস নং-১৪২৩; আন-নাসায়ী, আহমাদ ইবনু শু'য়াইব, ***আস-সুনানুল কুবরা***, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি.) খ. ৫, পৃ. ২৬৫, হাদীস নং-৫৫৯৬, ৭৩০৩।

২২৮. শব্দটি আম্মাজান 'আয়িশাহ (রা.) থেকে মুসনাদে আহমাদে এসেছে, ইমাম আহমাদ, ***মুসনাদ আহমাদ***, খ. ৪১, পৃ. ২২৪ এবং সুনানে আবূ দাউদে আলী (রা.)-এর বর্ণনায়ও এসেছে।

«أَرْبَعَةٌ يَحْتَجُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ، وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ، فَيَقُولُ: رَبِّ، قَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ، فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، فَيَقُولُ: رَبِّ، مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا»

'চার প্রকারের মানুষ কিয়ামতের দিন উজর-আপত্তি পেশ করবে। এক. বধির, দুই. নির্বোধ, তিন. বয়োবৃদ্ধ, চার. অন্তর্বর্তীকালে[২২৯] কিংবা মধ্যবর্তীকালে মৃত ব্যক্তি। বধির বলবে, হে আমার রব, ইসলাম এসেছে আমি তো কিছু শুনি না। নির্বোধ বলবে, ইসলাম এসেছিল কিন্তু আমার অবস্থা এমন ছিল যে, শিশুরা আমার ওপর গোবর নিক্ষেপ করত। বয়োবৃদ্ধ বলবে, ইসলাম এমন সময় এসেছিল হে রব, যখন আমি কিছুই বুঝার মতো ছিলাম না। আমি তো তখন জরাগ্রস্ত ছিলাম। অন্তর্বর্তীকালে মৃত ব্যক্তি বলবে, আমাদের কাছে আপনার কোনো রাসূল এসে আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট একজন দূত পাঠিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশের আদেশ দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি তারা সেখানে প্রবেশ করে তাহলে শীতল শান্তি তাদের ওপর বর্ষিত হতে থাকবে।'[২৩০]

---

২২৯. অন্তর্বর্তীকাল কিংবা মধ্যকাল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—দুই নবীর মধ্যকালীন সময় অর্থাৎ এক নবীর পর দ্বিতীয় নবী প্রেরণের পূর্বসময় কিংবা যে-সময়টাতে কোনো নবী-রাসূল আসেননি, যেমন : ঈসা (আ.) থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যবর্তী সময়। এদের বিষয়ে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে– আখেরাতে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। (দ্র. ইবনু হাজর, ***ফাতহুল বারী***, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.) খ. ৩, পৃ. ২৪৬; ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু 'উমর, ***তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম***, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৪১৯ হি. খ. ৫, পৃ. ৫০; আল-আলূসী, শাহাবুদ্দীন, ***রূহুল মা'আনী***, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৪১৫ হি. খ. ৬, পৃ. ১২৩)।

২৩০. ইমাম আহমাদ, ***মুসনাদে আহমাদ***, খ. ২৬, পৃ. ২২৮; হাদীস নং-১২৩০১; বাযযার, হাদীস নং-২১৭৪; ইবনু হিব্বান, হাদীস নং-৭৩৫৭।

এ হাদীসগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, বিবেক-বুদ্ধি ও বয়সের পরিপক্বতা না থাকলে শরী'য়াতের বিধিবিধান কারও ওপর আরোপিত হয় না।

আল-আহলিয়্যাহ (الأهلية) বা আইনভিত্তিক যোগ্যতা

ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'আল-আহলিয়্যাহ' বলতে আইনভিত্তিক যোগ্যতাকে বুঝায়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির আইনভিত্তিক উপযুক্ততা যা তাকে অধিকার দেয় এবং দায়িত্বশীল করে তোলে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব—

আল-আহলিয়্যাহ-এর আভিধানিক অর্থ : যোগ্যতা। যেমন— বলা হয়ে থাকে فُلَانٌ أَهْلٌ لِكَذَا অর্থাৎ সে এর যোগ্য।[২৩১]

আল-আহলিয়্যাহ-এর পারিভাষিক অর্থ : আল-আহলিয়্যাহ-এর পারিভাষিক অর্থ জানার আগে এর প্রকারভেদ জানা জরুরী; নিম্নে এর প্রকার ও পারিভাষিক সংজ্ঞা উল্লেখ করছি। আহলিয়্যাহ দুই প্রকার।[২৩২] যথা—

১. আহলিয়্যাতু ওজূব (أَهْلِيَّةُ وُجُوْب) বা ধারণ যোগ্যতা

'আহলিয়্যাতু ওজূব' বলতে বোঝানো হয়, মানুষের এমন ধারণ যোগ্যতা যার প্রেক্ষিতে তার জন্য কিছু অধিকার সাব্যস্ত হয় এবং তার ওপর কিছু দায়িত্ব আরোপিত হয়। এর অন্য একটি নাম হলো 'আয-যিম্মাহ' (الذمة) অধিকার এবং দায়িত্ব ধারণের যোগ্যতা; অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির আইনভিত্তিক উপযুক্ততা। ইসলামী আইনে প্রত্যেকটি মানুষ জন্মগতভাবে এই যোগ্যতার অধিকারী; ফলে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিরই এই 'আহলিয়্যাতু ওজূব' বা ধারণ যোগ্যতা রয়েছে। সুতরাং এ যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে—মানুষের জীবন।

২. আহলিয়্যাতু আদা (أَهْلِيَّةُ أَدَاءٍ) বা প্রয়োগের যোগ্যতা

'আহলিয়্যাতু আদা' বলতে বোঝানো হয়, মানুষের এমন যোগ্যতা যার জন্য তার কাছ থেকে দায়িত্ব পালন করাকে চাওয়া হয় এবং তার আদান-প্রদান গ্রহণযোগ্যতা পায়। মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিণত মস্তিষ্কসম্পন্ন হলে এ

২৩১. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৯২; আল-জুদাই', *তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৮৪।

২৩২. প্রাগুক্ত।

যোগ্যতা সাব্যস্ত হয়।[২৩৩] অতএব, এ যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে—সাবালক ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া

আহলিয়্যাহ কামিলাহ এবং নাকিসাহ (أهلية كاملة و ناقصة)

ইসলামী শরী'য়ার দৃষ্টিতে মানুষ জন্মগতভাবেই এই আইনভিত্তিক যোগ্যতার অধিকারী। এই অধিকার যেমনইভাবে তাকে সুবিধা দেয় তেমনইভাবে দায়িত্বশীল করে; যাতে স্বাভাবিক মানবিক মর্যাদা; সুবিধা ও দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের এই অধিকার জন্মলগ্ন থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর পর পর্যন্ত বিস্তৃত। জন্মলাভের পর মানুষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকারও বিকশিত হতে থাকে। মানুষের জীবন এবং বুদ্ধি-বিবেকের ভিন্নতার কারণে মানুষের এই যোগ্যতাও প্রভাবিত। এ ভিত্তিতে এই যোগ্যতা সম্পূর্ণ বা 'কামিল' এবং অসম্পূর্ণ বা 'নাকিস' হয়ে থাকে। মানুষের জীবনের স্তরসমূহের আলোচনার মাধ্যমে এটা বুঝা সহজ হবে। যেমন—

১. ভ্রূণ বা 'জানীন' (الجنين)

ইসলামী আইনে ভ্রূণ বা 'জানীন'কে জীবন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যে কালে শিশু মাতৃগর্ভে জীবন্ত অবস্থান করে সে সময় থেকে তার ধারণ যোগ্যতা শুরু হয়, যদিও এটা পরিপূর্ণ নয়; মায়ের গর্ভে অবস্থান করা ও মায়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে। এর দলীল হিসাবে হাদীসে এসেছে—আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বনু হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলার বিচার করেন। তারা পরস্পর মারামারি করেছিল। তাদের একজন অন্যজনের পেটে একটি পাথর নিক্ষেপ করে। যার পেটে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সে ছিল গর্ভবতী। পাথরের আঘাতে পেটের শিশুটি মৃত্যুবরণ করে। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিলেন যে, গর্ভের মৃত শিশুটির জন্য একটি পূর্ণ দাস অথবা দাসী দিয়াত বা রক্তপণ হিসাবে দিতে হবে। (যার পরিমাণ হলো ৫০০ দিরহাম)। জরিমানা আরোপকৃত মহিলার অভিভাবক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন সন্তানের জন্য আমার ওপর জরিমানা কেন হবে, যে পান করেনি, খাদ্য খায়নি, কথা বলেনি এবং কান্নাকাটিও করেনি। এ অবস্থায়

২৩৩. খল্লাফ, *'ইলমু উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ১২৭; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৯৩।

জরিমানা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতো দেখছি গণকদের ভাই।[২৩৪]

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, শরী'য়াত 'জানীন' বা ভ্রূণের জীবনকে গণ্য করে। আর যেহেতু ভ্রূণের জীবন আছে তাই সে ব্যক্তি; সুতরাং সে আইনভিত্তিক কিছু যোগ্যতার অধিকারী। এ ভিত্তিতে তার জন্য 'আহলিয়্যাতু ওজূব' বা ধারণ অধিকার সাব্যস্ত হবে কারণ, এ যোগ্যতার মাপকাঠি হলো জীবন। স্বাভাবিকভাবে যেহেতু গর্ভস্থ শিশুর জীবন তার মায়ের ওপর নির্ভরশীল সেহেতু তার আইনভিত্তিক অধিকার ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই তার যোগ্যতা বা আহলিয়্যাহ হবে 'আহলিয়্যাতু ওজূব নাকিসাহ' বা অসম্পূর্ণ ধারণ যোগ্যতা। এ ভিত্তিতে সে স্বত্বলাভের অধিকার রাখে। সে উত্তরাধিকার পায়, ওয়াসিয়্যাতযোগ্য হয়। অবশ্যই এর অধিকার সাব্যস্ত হলেও তার কোনো দায়িত্ব নেই; কারণ প্রয়োগিক যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে বুদ্ধি-বিবেক যা তার নেই। এজন্য গর্ভস্থ শিশুর অভিভাবক শিশুর জন্য যদি কোনো সম্পত্তি ক্রয় করে তবে তার মূল্যের জন্য শিশুর সম্পত্তি দায়ী থাকবে না।[২৩৫]

২. অবুঝ শিশু الطفل غير المميز (আত-তিফলু গাইরুল মুমাইয়্যিয)

ইসলামী শরী'য়াতের নিয়মানুযায়ী ভালো-মন্দের পার্থক্য করার জন্য নির্ধারিত কোনো বয়স নেই। এটা একটি আপেক্ষিক বিষয়। এক পরিবেশে এক এক সময় বুদ্ধি পরিণতি লাভ করে। পরিবেশের ভিন্নতার কারণে মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্বতা ত্বরান্বিত কিংবা বিলম্বিত হয়। অনেকটা অভ্যাস ও প্রথার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যখন কোনো শিশু ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না তখন সে অবুঝ শিশু হিসাবে বিবেচিত হবে। ইসলামী আইনবিদগণ এর একটি মাপকাঠি বা নিয়ম এভাবে ঠিক করেছেন যে, শিশু যদি মহিলাদের নিকট প্রবেশের ক্ষেত্রে শরী'য়াতে নিষিদ্ধ তিন সময়ে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করে, তখন তাকে অবুঝ শিশু হিসাবে ধরা হবে। যেমন: আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

২৩৪. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৫৭৫৮; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ্ মুসলিম***, হাদীস নং-১৬৮১।

২৩৫. খল্লাফ, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ১২৮; আল-জুদাই' ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৮৫-৮৬।

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো তখন এবং 'ইশার সালাতের পর; এ তিন সময় ছাড়া (অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে) তোমাদের এবং তাদের কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়, এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[২৩৬]

এ ধরনের অবুঝ শিশুদের ধারণ যোগ্যতা হলো 'আহলিয়্যাহ ওজূব কামিলাহ' বা পূর্ণ ধারণ যোগ্যতা। তাদের জন্য এবং তাদের ওপর অধিকার সাব্যস্ত হবে। যার জন্য তারা স্বত্বলাভের অধিকার রাখে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় এবং তাদের জন্য ওয়াসিয়্যাত, দান প্রভৃতিও বৈধ হয়। এ ধরনের শিশুদের কোনো 'আহলিয়াতু আদা' বা প্রয়োগের যোগ্যতা তথা দায়িত্ব প্রতিপালনের যোগ্যতা থাকে না। কারণ, মানবশিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন ধারণ যোগ্যতা অপূর্ণ বা ক্ষীণ থাকে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণ যোগ্যতা পূর্ণতা পায়। দায়িত্ব প্রতিপালন ও প্রয়োগের যোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়, বুঝ শক্তি হলেও সাবালক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ থাকে এবং সাবালক হলে তা পূর্ণতা পায়। সুতরাং এই অবুঝ শিশু শর'য়ী জবাবদিহিতা ও শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[২৩৭]

২৩৬. আল-কুরআন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ৫৮।

২৩৭. আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৮৭; স্যার আব্দুর রহীম, অনুবাদ: গাজী শাসছুর রহমান, ***ইসলামী আইনতত্ত্ব*** (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১৬৮।

৩. বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু যে এখনো সাবালক হয়নি الطفل المميز الذى لم يبلغ (আত-তিফলুল মুমাইয়িয আল্লাযি লাম ইয়াবলুগ)

এ ধরনের শিশুদের আহলিয়্যাহ হলো, 'আহলিয়্যাতু ওজূব কামিলাহ' বা পূর্ণ ধারণ যোগ্যতা এবং 'আহলিয়্যাতু আদা নাকিসাহ' বা অসম্পূর্ণ প্রয়োগের যোগ্যতা সাব্যস্ত হবে। কারণ বুঝ শক্তি হলেও এখনো সে নাবালক ও অপরিণত হওয়ার জন্য তার বিবেক-বুদ্ধি অপরিপূর্ণ। ফলে তার দায়িত্ব প্রতিপালন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অসম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জিত হবে। তাই তার ঈমান, আমল ও ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে এবং সাওয়াবও পাবে। কিন্তু, এর মধ্যে ত্রুটি পাওয়া গেলে তাকে শর'য়ী জবাবদিহিতা কিংবা পরকালীন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না। তেমনইভাবে তার ওপর অন্য কোনো অধিকার বলবৎ করা যাবে না, বরং তার কোনো দায়িত্ব থাকলে তা তার অভিভাবক আদায় করবে। তার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও বিধান রয়েছে। যেমন–

- **ক.** এমন আর্থিক লেনদেন যার মধ্যে শুধুই তার উপকার ও সুবিধা রয়েছে, কিন্তু কোনো ধরনের ক্ষতি নেই। সে ধরনের আর্থিক লেনদেন করা তার জন্য বৈধ। কেননা, এতে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। যেমন : উপহার গ্রহণ করা, সে কোথাও চাকুরি করলে তার বেতন নেয়া ইত্যাদি।
- **খ.** এমন লেনদেন যার মধ্যে শুধুই তার ক্ষতি রয়েছে। এ ধরনের লেনদেন করার অধিকার তার নেই, এমনকি তার অভিভাবকেরও নেই। যেমন : তার সম্পদ থেকে দান করা, ওয়াক্ফ করা, কিংবা তার অধিকার ছেড়ে দেওয়া প্রভৃতি। কেননা সে এখনো তার সম্পদ হস্তান্তরের উপযুক্ত হয়নি; এমনকি তার অভিভাবক অনুমতি দিলেও সে তার জন্য এ ধরনের শুধুই ক্ষতিকর লেনদেন করতে পারবে না। তবে তার সম্পদে যদি যাকাত আসে, তাহলে তা থেকে তার অভিভাবক যাকাত আদায় করবে। তেমনইভাবে যদি সে কারও সম্পদ নষ্ট করে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণও তার অভিভাবকই তার সম্পদ থেকে আদায় করবে।
- **গ.** এমন আর্থিক লেনদেন, যেখানে তার উপকার এবং ক্ষতি উভয়টার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন : ক্রয়-বিক্রয়; এতে লাভ-লোকসান উভয়টার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে এই ক্রয়-বিক্রয় তার অভিভাবকের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে। যদি লাভজনক হয় তাহলে অভিভাবক তা মঞ্জুর করবে। অন্যথায় নয়।(২৩৮)

২৩৮. আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৮৮।

৪. বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালক العاقل البالغ (আল-'আক্বিলু আল-বালিগু)

এটাই মানুষের পরিণত ও পরিপূর্ণ বয়স যার উভয় প্রকার আইনি যোগ্যতা বা 'আহলিয়্যাহ' তথা ধারন যোগ্যতা ও প্রতিপালনের প্রায়োগিক যোগ্যতা পরিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত হয়। এ ধরনের বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালক মানুষই পরিপূর্ণ 'মুকাল্লিফ' তার ওপর শরী'য়াত নির্ধারিত সকল বিধান প্রযোজ্য হবে এবং তার সকল লেনদেনের জন্য তাকে জবাবদিহি করা হবে।(২৩৯)

আইনভিত্তিক যোগ্যতার অন্তরায়সমূহ

মানুষ সাবালক হওয়ার পর সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ আইনভিত্তিক যোগ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এমন কিছু কাজ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, যা তার এই অর্জিত যোগ্যতাকে খর্ব করে কিংবা ক্ষীণ করে অথবা প্রভাবিত করতে পারে। ইসলামী শরী'য়াতে এগুলোকে 'আওয়ারিদ্বুল আহলিয়্যাহ' (عوارض الأهلية) বা যোগ্যতার অন্তরায় বলা হয়। এ ধরনের অন্তরায় দুই প্রকার।(২৪০) যথা—

এক. অনর্জিত অন্তরায়সমূহ عوارض كونية (আওয়ারিদ্বুন কাওনিয়্যাহ)

অনর্জিত অন্তরায়সমূহকে আরবীতে عوارض كونية (আওয়ারিদ্বুন কাওনিয়্যাহ) বলা হয়।

অনর্জিত অন্তরায় বলতে বোঝানো হয়, এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা যা মানুষের সক্ষমতার বাইরে এবং আইনভিত্তিক যোগ্যতা বা 'আহলিয়্যাহ'কে প্রভাবিত করে। এ গুলোকে আসমানি অন্তরায়ও বলা হয়। অনর্জিত অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপ—

(ক) উন্মাদনা الجنون (আল-জুনূন)

এটা মানুষের মস্তিষ্কে এমন একটি সমস্যা, যার নিয়ন্ত্রণ তার হাতে থাকে না এবং এর কারণে তার কাজ ও কথা প্রভাবিত হয়। ফলে তার আচরণ, কথা ও কাজ এমনভাবে প্রকাশ পায়, যা সাধারণত কোনো জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে প্রকাশ পায় না। এ ধরনের উন্মাদ লোকের

২৩৯. খল্লাফ, *'ইলমু উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ১২৮-১২৯; আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৮৫-৮৮।

২৪০. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী*, খ. ১, পৃ. ৪৯৫; আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৮৫-৯৬।

জন্য 'আহলিয়্যাতু ওজূব কামিলাহ' বা পূর্ণ ধারণ যোগ্যতা সাব্যস্ত হবে। কেননা তার জীবন আছে। যার দরুন তার জন্য সমস্ত অধিকার সাব্যস্ত হবে। কিন্তু তার ওপর 'আহলিয়াতু আদা' বা প্রয়োগের যোগ্যতা প্রযোজ্য হবে না। কেননা তার 'আক্বল বা বিবেক-বুদ্ধি ঠিক না থাকার কারণে সে এ যোগ্যতার উপযুক্ত নয়। ফলে তার লেনদেন 'তাসাররুফ' শুদ্ধ হবে না।

দলীল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ»

'তিন ব্যক্তি থেকে কলম (হিসাব, জবাবদিহিতা) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্য থেকে নির্বোধ পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ হয়।'(২৪১)

(খ) জড়বুদ্ধি, বোকা العَتَه। (আল-আতাহ)

জড়বুদ্ধি বলতে, মানুষের মস্তিষ্কে এমন একটি সমস্যা যার কারণে সে কখনো বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করে, আবার কখনো সে পাগলের ন্যায় আচরণ করে। সুতরাং এর ওপর বিবেচনা করে উক্ত ব্যক্তির দুটি অবস্থা রয়েছে–

প্রথমত, যখন সে পাগলের ন্যায় আচরণ করবে, তখন তার ওপর উল্লেখিত পাগলের হুকুম বর্তাবে।

দ্বিতীয়ত, যখন সে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় আচরণ করবে তখন তার জন্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির হুকুম প্রযোজ্য হবে।

উক্ত ব্যক্তির জন্য সর্বাবস্থায়ই 'আহলিয়্যাতু ওজূব কামিলাহ' সাব্যস্ত হবে, তবে পাগল অবস্থায় 'আহলিয়্যাতু আদা' সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যাবে এবং ভালো অবস্থায় তার ওপর 'আহলিয়্যাতু আদা নাকিসাহ' প্রযোজ্য হবে; কারণ সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ নয়।

(গ) ভুলে যাওয়া বা বিস্মরণ النسيان। (আন-নিসয়ানু)

ভুলে যাওয়া বা বিস্মরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, সুতরাং এতে মানুষের কোনো ইচ্ছা বা অভিপ্রায় থাকে না। এ ভিত্তিতে আইনি যোগ্যতায় এর কোনো প্রভাব নেই; যার দরুন এটা উভয় প্রকার 'আহলিয়্যা' বা যোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে না। ফলে তার 'আহলিয়্যাতুল ওজূব কামিলাহ' বা

২৪১. ইমাম আবূ দাউদ, হাদীস নং-৪৪০১; ইমাম তিরমিযী, হাদীস নং-১৪২৩। হাদীসটি সহীহ।

পূর্ণ ধারণ যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। তেমনইভাবে 'আহলিয়্যাতু আদা কামিলা' বা সম্পূর্ণ প্রয়োগ যোগ্যতাও সাব্যস্ত থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত কাজের বিধানে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়াকে উপযুক্ত অজুহাত হিসাবে গণ্য করা হয়। ফলে এর কিছু প্রভাব থাকে; বিধায় এটাকেও অন্তরায় হিসাবে গণনা করা হয়। আর ভুলে যাওয়ার প্রভাব এতটুকুই যে, ভুলে যাওয়ার কারণে যদি কোনো গুনাহের কাজ সংগঠিত হয়ে যায় তার জন্য পাপ হবে না এবং পরকালীন দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু, শরী'য়াত যেখানে ভুলে যাওয়ার কারণে ছাড় ও রুখসাত দিয়েছে, তা ব্যতীত অন্যান্য ভুলে বাদ যাওয়া কাজের দায়শোধ স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। ভুলের কারণে তা রহিত হবে না। নিম্নের উদাহরণগুলোর মাধ্যমে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে—

১. যদি কোনো ব্যক্তি সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে ভুলে যাওয়াকে অজুহাত বা অপারগতা ধরে বাদ দেওয়া যাবে না, বরং স্মরণ হওয়ার পর অবশ্যই দায়শোধ দিতে হবে। তবে ভুলে যাওয়ায় ব্যক্তির কোনো হাত নেই, সেজন্য তার পাপ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذلك»

'যে-কেউ কোনো সালাতের কথা ভুলে যাবে যখনই স্মরণ হবে সে যেন তা পড়ে নেয়। সালাতের কোনো কাফ্‌ফারা নেই সালাত ব্যতীত।'(২৪২)

২. কোনো ব্যক্তির কাছে আমানাত রাখা হলো। সে এমন স্থানে আমানতের সম্পদ রাখল, যা সে নিজেই ভুলে গেছে। তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক। কেননা যে কাজের মাধ্যমে অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন হয় সে কাজে ভুলে যাওয়াকে অজুহাত বা অন্তরায় হিসাবে দাঁড় করানো যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

'অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেন, আমানতকে তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে।'(২৪৩)

২৪২. ইমাম বুখারী, **সহীহুল বুখারী**, হাদীস নং-৫৯৭।

অতএব, এটা মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার, সুতরাং ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে বান্দাই তার পূর্ণ মালিক। সে তার অধিকার চাইতেও পারে আবার মাফও করে দিতে পারে। তবে চাইলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩. যদি কোনো ব্যক্তি সাওম থাকা অবস্থায় ভুলে খাবার খেয়ে ফেলে, অথবা পান করে, তাহলে সে তার সাওম পূর্ণ করবে। তার খাওয়া ও পান করা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দানস্বরূপ ছাড়। কারণ এটা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার, ভুলের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তা মাফ করে দেবেন। যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»

'যদি কেউ ভুলে খায় এবং পান করে তাহলে সে যেন তার সাওম পরিপূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।'(২৪৪)

আর ভুলকারী থেকে গুনাহ রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه»

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মত থেকে ভুল করা, ভুলে যাওয়ার এবং যে বিষয়ে বলপ্রয়োগ করে বাধ্য করা হয় তার গুনাহ উঠিয়ে নিয়েছেন।'(২৪৫)

(ঘ) নিদ্রা ও অজ্ঞান النَّوْمُ وَالْإِغْمَاءُ (আন-নাওমু ওয়াল ইগমাউ)

ঘুমন্ত ব্যক্তি ও অজ্ঞান ব্যক্তির ওই অবস্থায় 'আহলিয়্যাতু আদা' বা প্রয়োগ যোগ্যতা থাকে না বরং মানুষের জাগ্রত ও চৈতন্য অবস্থায়ই কেবল 'আহলিয়্যাতু আদা' বা প্রয়োগ যোগ্যতা প্রযোজ্য হয়। ফলে নিদ্রিত ও মূর্ছিত অবস্থায় যেসব ভুল ও দায়িত্ব লঙ্ঘিত হয় এবং সে কারণে যে গুনাহ ও তিরস্কার-এর উপযুক্ত হয়, তা শরী'য়াত উঠিয়ে দিয়েছেন। আবু কাতাদাহ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

২৪৩. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ৫৮।

২৪৪. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-১৯৩৩।

২৪৫. ইমাম ইবনু মাজাহ, ***সুনানু ইবন মাজাহ***, হাদীস নং-২০৪৫, হাদীসটি সহীহ।

«لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِيْ اليَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وقْتُ الأُخْرى»

'ঘুমন্ত অবস্থায় কোনো সীমালঙ্ঘন নেই, সীমালঙ্ঘন তো জাগ্রত অবস্থায়, সালাতকে এত দেরি করা যে অন্য ওয়াক্ত প্রবেশ করে।'(২৪৬)

তবে এই (নিদ্রা ও অজ্ঞান) অজুহাত চলে যাওয়ার পরে ভুলটাকে শুধরানো সম্ভব হলে তা শুধরাতে হবে এবং ছুটে যাওয়া কাজটাকে পুনরায় সম্পাদন করতে হবে। যেমন–

«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

'আনাস ইবন মালেক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সালাতের কথা ভুলে যায় অথবা সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে যায় সেটার কাফফারা হলো; যখনই মনে পড়বে তখনই আদায় করে নেবে।'(২৪৭)

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

«إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي»

'যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে থাকে অথবা ভুলে যায় সালাত আদায় করতে; সুতরাং যখনই স্মরণ হবে তখনই আদায় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।'(২৪৮)

তা ছাড়া যদি ঘুমন্ত অথবা বেহুঁশ ব্যক্তি বান্দার হক্ক বা ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ভুল বা ক্ষতি করে তবে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। যেমন : কেউ ঘুমের মধ্যে কারও ওপর এমনভাবে পড়ে যায় যার ফলে সে ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে ভুলটা ভুল হিসাবে সাব্যস্ত

২৪৬. ইমাম আবূ দাউদ, ***আস-সুনান***, হাদীস নং-৪৪১; শুআইব আল-আরনাওউত হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

২৪৭. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ্ মুসলিম*** , হাদীস নং-৩১৫।

২৪৮. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ্ মুসলিম***, হাদীস নং-৩১; আল-কুরআন, ২০ (সূরা ত্ব-হা) : ১৪।

হবে ইচ্ছাকৃত হিসাবে নয়, যেহেতু এ হত্যায় তার ইচ্ছা ছিল না সেহেতু ভুল করে হত্যার শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) অসুস্থতা المَرَض। (আল-মারাদ্ব)

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য উভয় প্রকার 'আহলিয়্যাহ' (আহলিয়্যাহতু ওজূব ও আহলিয়্যাহতু আদা) বা ধারণ ও প্রয়োগ যোগ্যতা সাব্যস্ত হবে। কিন্তু, অসুস্থতা বিধানের ক্ষেত্রে কিছু প্রভাব ফেলে বিধায় এটাকেও অন্তরায় হিসাবে গণনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার তথা গণ-অধিকারের ক্ষেত্রে যে বিষয়ে সে অপারগ সে ক্ষেত্রে ওই অধিকার রহিত হবে। যেমন : অসুস্থতার জন্য দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে অক্ষম হলে না দাঁড়ানোর সুযোগ, রমাদ্বান মাসে সাওম রাখতে অক্ষম হলে সাওম না রাখার ছাড় প্রভৃতি।

অবশ্য অসুস্থ ব্যক্তির সব ধরনের লেনদেন বৈধ ও শুদ্ধ; কারণ সে পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ফলে তার পরিপূর্ণ 'আহলিয়্যাতু আদা' বা প্রয়োগ যোগ্যতা বলবৎ থাকবে। সুতরাং তার ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে, তালাক প্রভৃতি শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হবে। তবে কোনো কোনো ফকীহ মৃত্যুব্যাধিতে[২৪৯] আক্রান্ত ব্যক্তিকেও যোগ্যতার প্রশ্নে দুর্বল হিসাবে গণ্য করেছেন এবং ঐ অবস্থায় তার লেনদেন অগ্রহনযোগ্য বলেছেন। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুব্যাধি মানুষের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি দুর্বল করে ফেলে। ফলে তার ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, তালাক, হেবা-দান প্রভৃতি শুদ্ধ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে ফিক্হী

---

২৪৯. মৃত্যুব্যাধির সংজ্ঞার্থ বিভিন্নভাবে এসেছে—
হানাফী মাযহাবে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : যে অসুস্থতা মানুষকে কাবু করে ফেলে, চলাফেরা করতে পারে না, স্থায়ী শয্যাশায়ী করে দেয়।
মালেকী মাযহাবে এসেছে : যে রোগকে চিকিৎসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে।
শাফি'য়ী মাযহাবে বলা হয়েছে : যে রোগের ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ মৃত্যুবরণ করে।
হাম্বলী মাযহাব মতে, যে রোগে প্রায়শ মানুষের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যু এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব, যে রোগে মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল হয় অথবা মৃত্যুর ভয় হয় এবং যার জন্য রোগী নিজের সাধারণ কাজকর্ম, দায়িত্ব, কর্তব্যপালন করতে অপরাগ হয় তাই মরণব্যাধি। (আল-কাসানী, আলাউদ্দিন, ***বাদায়িউ'স সানায়ি'*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ২২৪; আল-আব্দারী, মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ, ***আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৬৬৪; আশ্- শারবীনী, শামছুদ্দিন, ***মুগনিল মুহতাজ*** (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৪১৫ হি. ১৯৯৪ খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৮২; ইবনু কুদামা, মুয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ, ***আল-মুগনী***, (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১ম প্র., তা. বি., খ. ৬, পৃ. ৫০৭).

গ্রন্থসমূহে ফকীহগণের বিভিন্ন মত ও বিস্তারিত পর্যালোচনা রয়েছে, যা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা সমীচীন হবে না।[২৫০]

(চ) হায়েয-নিফাস (الْحَيْض وَ النِّفَاس)

'হায়েয' দ্বারা বোঝানো হয়, ওই প্রাকৃতিক রক্ত যা বাহ্যিক কোনো কার্যকারণ ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে সাবালক ঋতুমতী নারীদের বের হয়, এটা ঋতুস্রাব, রক্তস্রাব, মাসিক নামেও পরিচিত। 'নিফাস' দ্বারা বোঝানো হয়, সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের জরায়ু থেকে যে রক্ত বের হয়। এই দুটি প্রাকৃতিক অসুস্থতা শুধু মহিলাদের জন্য। এই দুইটি 'আহলিয়্যাতে ওজূব' এবং 'আদা'কে বাধাগ্রস্ত করে না। তবে এই দুটি অসুস্থতা মহিলাদের জন্য সালাত, সাওম, তাওয়াফ-এর অন্তরায়স্বরূপ। তাই এই দুই অবস্থায় সালাত ও সাওম আদায় করতে হবে না, তবে সুস্থ হলে সালাত-এর কাযা বা দায়শোধ করতে হবে না। কিন্তু সাওম ও তাওয়াফে ইফাদ্বাহ করতে হবে।[২৫১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস,

« عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ، قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

'মু'আযাহ আল-'আদাওয়িয়্যাহ (রাদি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি 'আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহাকে প্রশ্ন করলাম হায়েযা মহিলাদের কী হলো? তারা সাওম কাযা করে কিন্তু সালাত কাযা করে না? 'আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, তুমি কি হারুরী সম্প্রদায়ের? (খারেজীদের একটা গ্রুপ) আমি বললাম না। তবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম; 'আয়িশাহ বললেন, যখন আমরা হায়েযা হতাম তখন আমাদেরকে সাওম কাযা করার আদেশ দেওয়া হতো, সালাত কাযার আদেশ দেওয়া হতো না।'[২৫২]

---

২৫০. আল-কাসানী, ***বাদায়িউ'স সানায়ি'*** খ. ৭, পৃ. ২২৫; ইবনু কুদামা, ***আল-মুগনী***, খ. ৭, পৃ. ২১২; সম্পাদনা পরিষদ, ***আল-মাউসূয়া'তুল ফিক্হিয়্যাহ***, খ. ৩৭, পৃ. ২২।

২৫১. আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ৮৯-৯৫।

২৫২. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-৩৩৫।

অন্য হাদীসে এসেছে,

«عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجْنَا مع النَّبي - ﷺ - لا نَذْكُرُ إلاَّ الحجَّ، فلمَّا جِئنَا سرِفَ طَمِثتُ، فدَخلَ عليَّ النَّبيُّ - ﷺ - وأنَا أبكِي، فقال: "مَا يُبكِيكِ؟" قلتُ: لَوَدِدْتُ والله أنِّي لَمْ أَحُجَّ العامَ، قالَ: "لَعَلَّكِ نُفِستِ" قلتُ: نَعمْ، قالَ: "فإنَّ ذلكَ شيءٌ كَتَبَهُ اللهُ على بناتِ آدَمَ، فَافعلِي ما يفعلُ الحَاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفِي بالبيتِ حتَّى تَطْهُرِي»

'আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আমি ঋতুমতী হই। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পছন্দনীয়। তিনি বললেন : সম্ভবত তুমি ঋতুমতী হয়েছ! আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এটাতো আদমকন্যাদের জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন। তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মতো সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বার তাওয়াফ করবে না।'(২৫৩)

অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে এ দুটি অন্তরায় নয়, এটাই দলীলসম্মত মত। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -ﷺ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»

'আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—'মসজিদ থেকে আমার জায়নামাজ নিয়ে এসো'। 'আয়িশাহ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তিনি বললেন, 'তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নয়।'(২৫৪)

২৫৩. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৩০৫; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-১২১১।

২৫৪. ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-২৯৮।

(ছ) মৃত্যু الموت (আল-মাউত)

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উভয় প্রকার যোগ্যতা বা 'আহলিয়্যাহ' (আহলিয়্যা ওজুব এবং আদা) শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কিছু অধিকার কি বাকি থাকবে যা মৃত ব্যক্তি থেকে চাওয়া হবে এবং যা তার পক্ষ থেকে আদায় করা **সম্ভব?**

কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কর্জ বা দেনা শোধ মৃত ব্যক্তির ওপর অধিকার হিসাবে বাকি থাকবে যা তার পক্ষ থেকে তার উত্তরাধিকারীদের আদায় করতে চাওয়া হবে। কর্জ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। এই কারণে উত্তরাধিকার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনের পূর্বেই তা থেকে কর্জ পরিশোধ করতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾

'এসবই সে যা ওসিয়াত করে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর।'(২৫৫)

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«عن سلَمَةَ بنِ الأكوَعِ رضي الله عنهُ أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أُتِيَ بجنَازَةٍ ليُصلِّيَ عليها، فقالَ: "هلْ عليهِ مِنْ دَينٍ؟" قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثمَّ أُتِيَ بِجنَازَةٍ أخرَى فقالَ: "هلْ عليهِ منْ دينٍ؟" قالوا: نعَمْ، قالَ: "صلُّوا على صاحبِكُمْ" قال أبوقتادَةَ: عليَّ دَينُهُ يا رسولَ الله، فصلَّى عليهِ»

'সালামা ইবনুল আকওয়া' রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জানাযার সালাত আদায়ের জন্য একটি জানাযা উপস্থিত করা হলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোনো ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোনো ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের সঙ্গীর সালাতে জানাযা তোমরাই আদায় করে নাও। আবূ কাতাদাহ রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু

২৫৫. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আন-নিসা) : ১১

বললেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার ঋণের দায়িত্ব আমার ওপর। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।'(২৫৬)

দুই. অর্জিত অন্তরায়সমূহ عوارض مكتسبة (আওয়ারিদ্বুন মুকতাসিবাহ)

অর্জিত অন্তরায় বলতে বোঝানো হয়, আইনভিত্তিক যোগ্যতা বা 'আহলিয়্যাহ'য় এমন কিছু প্রভাব, যাতে মানুষের দখল ও হাত রয়েছে। অর্জিত অন্তরায়তাসমূহ নিম্নরূপ—

(ক) অজ্ঞতা الجهل (আল-জাহ্‌ল)

তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞের জন্য উভয় প্রকার আইনভিত্তিক যোগ্যতা বা 'আহলিয়্যাহ' (আহলিয়্যাহ ওজূব ও আদা) থাকে। কারণ, উভয় প্রকার যোগ্যতার মাপকাঠি তথা জীবন এবং বিবেক-বুদ্ধি তার মধ্যে বিদ্যমান। প্রত্যেক মুসলিম তার ধর্মীয় আইন সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে—ইসলাম এটাই প্রত্যাশা করে। তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য অন্তরায় বা অজুহাত নয়। তবে এর প্রভাব হচ্ছে, আল্লাহ্‌র হক্ক বা গণ-অধিকারের ক্ষেত্রে কেউ যদি ইসলামের বিধান সম্পর্কে জানতে যথাযথ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করতে না পারে, তখন সেটা অজুহাত হবে এবং সে পরকালীন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে। যেমন– কোনো মানুষ জানে না যে সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওযু শর্ত। তাই সে অনেকদিন যাবৎ ওযু ছাড়াই সালাত আদায় করেছে, এরপর সে ওযুর বিধান জানতে পারল; ফলে তাকে ওযু ছাড়া আদায়কৃত সালাত সমূহের দায়শোধ বা 'কাযা' দিতে হবে না। এর দলীল—

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ غَيْرَ هَذَا. فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»

২৫৬. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-২২৯৫।

'আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত: আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন একজন সাহাবী এসে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি তো সালাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে পূর্বের ন্যায় সালাত আদায় করলেন। এরপর এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। তিনি বললেন, ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি তো সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন। তখন সাহাবী বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন—আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। এরপর রুকু'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু' করবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করবে। অতঃপর সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর তোমার পুরো সালাতে এভাবেই শেষ করবে।'(২৫৭)

এই হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তি অশুদ্ধভাবে সালাত আদায় করত; কারণ সে বিশুদ্ধভাবে সালাত আদায় করা জানত না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কীভাবে শুদ্ধ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে হয়, তা শিক্ষা দিলেন এবং তাকে পূর্বে ভুল পদ্ধতিতে আদায় করা সালাতসমূহের কাযা বা পুনরাবৃত্তি করতে আদেশ দেননি। সুতরাং বুঝা গেল সত্যিকারের অজ্ঞতা ইবাদত তথা আল্লাহ্‌র অধিকারের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য অজুহাত। কিন্তু, জানার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অলসতা করে এবং যারা জ্ঞানী তাঁদের জিজ্ঞেস না করে, তাহলে এই অজ্ঞতার অজুহাতে সে পরিত্রাণ পাবে না বরং গুনাহগার হবে এবং শাস্তি পাবে।(২৫৮)

তা ছাড়া তথ্যের অজ্ঞতার অজুহাত ব্যক্তি, অবস্থা ও বিষয় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী [৮৪৯-৯১১ হি.] (রহ.)-এর কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

২৫৭. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৭৫৭, ৭৯৩, ৬২৫১; ইমাম মুসলিম, ***সহীহু মুসলিম***, হাদীস নং-৭৭১।

২৫৮. আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৭৫।

'কেউ এমন বিষয়ে অজ্ঞ হলে যা হারাম এবং নিষিদ্ধ হওয়া অধিকাংশ মানুষ জানে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেবলমাত্র নও মুসলিম কিংবা দূরের কোনো বেদুঈন এলাকায় বেড়ে উঠা ব্যক্তি ছাড়া—যেখানে এইসব হারাম অস্পষ্ট। যেমন : ব্যভিচার, খুন, চুরি, মদ্যপান, সালাতে কথা বলা, সাওম অবস্থায় খাওয়া... প্রভৃতি হারাম হওয়া।'[২৫৯]

সুতরাং প্রত্যেক অজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞতা অজুহাতযোগ্য নয়; অন্যথায় যদি প্রত্যেক অজ্ঞতা অজুহাতযোগ্য হতো, তাহলে জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞতাই কল্যাণকর ও বেশি উপকারী হতো! অতএব, অজ্ঞকে শরী'য়াত অপারগ হিসাবে গণ্য করেছে, তার প্রতি দয়া করে; অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টার পরেও সম্ভাবনা না থাকার অজুহাতে যা তার জন্য একটি বিশেষ ছাড় ও লঘুকরণস্বরূপ, অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে প্রশমিত করার জন্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফে'য়ী (রাহ.) যথার্থই বলেছেন—

'যদি অজ্ঞরা কেবল অজ্ঞতার জন্য অপারগ হিসাবে গণ্য হতো, তাহলে জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞতাই উত্তম হতো; কেননা অজ্ঞতা মানুষের দায়িত্ব লঘু করত এবং তার অন্তরকে কর্তব্য পালনের কষ্ট ও দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিত। সুতরাং বিধানের তথ্য-জ্ঞান প্রচার-প্রসার হওয়ার পর কোনো বান্দার পক্ষে কোনো অজুহাত নেই; যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।'[২৬০]

তাই যারা পুরাতন মুসলিম, মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েছে কিংবা মুসলিম বিশ্বে জন্ম নিয়েছে, তাদের বেলায় অজ্ঞতার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়; শরী'য়াতের বিধিবিধান যতেষ্ট প্রচার-প্রসার হওয়ার দরুন ও এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকার কারণে।

(খ) ভুল করা الخطأ (আল-খাতাউ)

এটা ইচ্ছার বিপরীত, অনভিপ্রেত ও ভ্রমাত্মক ঘটনা বা দুর্ঘটনা। এটা উভয় প্রকার আইনভিত্তিক যোগ্যতা বা 'আহলিয়্যাহ'কে বাধাগ্রস্ত করে না। কারণ

২৫৯. আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম মু., ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ২০১)।

২৬০. আয-যারকাশী, বদরুদ্দীন, *আল-মানসূর ফিল-কাওয়াদিল ফিক্হিয়্যাহ* (কুয়েত : ধর্ম মন্ত্রণালয়, ২য় মু. ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৭।

ভুলকারীর মধ্যে উভয় প্রকার আইনভিত্তিক যোগ্যতার মাপকাঠি বিদ্যমান। তবে এটা গুনাহ এবং তিরস্কার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি উপযুক্ত অজুহাত; কারণ এতে মানুষের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الله وضَعَ عنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيَانَ ومَا اسْتُكرِهُوا عليه»

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মত থেকে ভুল করা, ভুলে যাওয়া এবং যে বিষয়ে তাকে বলপ্রয়োগ করে বাধ্য করা হয় তার গুনাহ উঠিয়ে নিয়েছেন।'[২৬১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

'আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ), আর আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২৬২]

সুতরাং আল্লাহ্র অধিকারের বিষয়ে, ভুলবশত কোনো পাপ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলে সে ক্ষেত্রে ভুলকে অজুহাত হিসাবে ধরা হবে এবং পরিত্রাণ পাবে। যেমন : যে ব্যক্তি কিবলার দিক ঠিক করতে পারছে না সে চেষ্টা করার পর, চিন্তাভাবনা করে যে দিকে কিবলা মনে করে সালাত আদায় করল সেটা অন্যদিক ছিল, তাহলে তার এ ভুল মার্জনীয়। তেমনইভাবে কোনো বিচারক অথবা মুফতি যদি কোনো গবেষণাযোগ্য বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা-গবেষণা করে মতামত ব্যক্ত করে, সেখানে কোনো ভুল পাওয়া গেলে তা ক্ষমার্হ। কিন্তু বান্দার অধিকারের বিষয়ে ভুলবশত যদি অন্যের ক্ষতি বা লোকসান করে তাহলে সে ক্ষেত্রে ভুলকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করানো যাবে না। তবে ভুলবশত খুন করলে তাকে একই ধরনের 'কিসাস' শাস্তি দেওয়া হবে না বরং কাফ্ফারা বা অন্য শাস্তি দেওয়া হবে। তেমনইভাবে যে কাজে 'হদ' বা নির্দিষ্ট শাস্তি আছে সে কাজ ভুলবশত করলে তাকে 'হদ' শাস্তি দেওয়া হবে না, কিন্তু 'তা'যীর' বা অনির্দিষ্ট যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে।

২৬১. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ২০৪৫, হাদীসটি সহীহ।

২৬২. আল-কুরআন, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব) : ৫।

অন্যান্য লেনদেনের বিষয়ে যদি ভুলবশত কোনো কাজ করে ফেলে সে ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ট ইমামদের মতে, এ লেনদেন শুদ্ধ হবে না; ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের অনুপস্থিতির কারণে। হানাফীগণের মতে ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য লেনদেন শুদ্ধ হবে। কারণ মানুষ কোন্ সময় নিজ ইচ্ছায় কাজ করেছে আর কখন ভুলবশত করেছে তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। তাই একজন সাবালক, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যা করেছে কিংবা বলেছে তা নিজের ইচ্ছানুযায়ীই করেছে বলে ধরে নেয়া হয়, ভুলবশত নয়। তার কাজের বা কথার পেছনে কী লুক্কায়িত তা অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। তা ছাড়া অনুসন্ধান করলেও যে মানুষের মানসিক ইচ্ছা জানা যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং নিয়ম হচ্ছে যা স্বাভাবিক ও সাধারণ তার প্রেক্ষিতেই বিধান হয়। আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার ইচ্ছা এবং সম্মতি উভয়েরই প্রয়োজন। ভুলবশত বিক্রয়ে সম্মতি থাকে না; সে কারণে তা শুদ্ধ নয়। হানাফীগণ মনে করেন যে, সম্মতি মনের বিষয় হলেও মুখে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, জমহুরের অভিমতই অধিক যুক্তিসম্মত।[২৬৩]

(গ) উপহাস الهزل (আল-হায্‌লু)

ইসলামী আইনে উপহাস বা হায্‌ল বলতে বোঝানো হয়, কোনো শব্দ বা বাক্য কিংবা অভিব্যক্তি উচ্চারণ করে তা দ্বারা উক্ত শব্দের, বাক্যের নির্দিষ্ট আক্ষরিক অর্থ উদ্দেশ্য না করা কিংবা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য করা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো শব্দ, বাক্য কিংবা অভিব্যক্তি উচ্চারণ করার পর সে চায় না যে, এর যথার্থ অর্থ বুঝা যাক—তাকে উপহাসকারী বা হাযেল বলা হয়। এটাও উভয় প্রকার আইনভিত্তিক যোগ্যতা বা 'আহলিয়্যাহ'কে বাধাগ্রস্ত করে না। কারণ উপহাসকারীর মাঝে উভয় প্রকার আইনভিত্তিক যোগ্যতার মাপকাঠি বিদ্যমান। তবে উপহাসের প্রভাব ও কার্যকারিতা কতটুকু তা জানতে হলে, উপহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত মৌখিক পদক্ষেপ/ক্রিয়াকলাপগুলোর প্রকার জানতে হবে। তা তিন প্রকার।[২৬৪] যথা–

১. আল-ইখবারাত (الإخبارات) বা স্বীকারোক্তি। যেমন : কেউ যদি উপহাস করে বলে, অমুক আমার কাছে এক হাজার টাকা পাবে অথবা এই সম্পদটি আমার। তাহলে তা ধর্তব্য হবে না; কেননা উপহাসস্থলে

২৬৩. আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৯৭-৯৮; স্যার আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

২৬৪. আল-জুদাই', ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ৯৮।

কোনো স্বীকৃতি, স্বীকারোক্তি প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ এই স্বীকারোক্তিগুলো মিথ্যা।

২. আল-ই'তিকাদাত (الاعتقادات) বা বিশ্বাসগত বিষয়। উপহাসকারী বিশ্বাসগত বিষয়ে যা বলবে তা সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে তাকে ছাড় দেওয়া যাবে না যে তার আসল উদ্দেশ্য এটা ছিল না। যেমন : কোনো ব্যক্তি উপহাস করে যদি কুফুরী অর্থবাহক কথা বলে তাহলে সে কুফুরীর অপরাধে অপরাধী হবে। সে মুরতাদ হবে; কেননা তার এই উপহাস দ্বারা দ্বীনকে হীন করা হয়। তাই উপহাস করেও ইসলামের অবমাননাকর কোনো কিছু করা আইনসম্মত নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

'আর আপনি তাদের প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?! তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফুরী করেছ।'[২৬৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعْ إِلَى الإِسْلَامِ سَالِمًا»

'যে ব্যক্তি শপথ করে বলে, আমি ইসলাম থেকে মুক্ত, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে সে যা বলেছে তাই হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তা হলে সে কখনো ইসলামে সঠিকভাবে ফিরে আসতে পারবে না।'[২৬৬]

২৬৫. আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবা) : ৬৫-৬৬।

২৬৬. ইমাম আবূ দাউদ, ***সুনান আবূ দাউদ***, হাদীস নং-৩২৫৮; ইবনু মাজাহ, ***আস-সুনান***, হাদীস নং-২১০০। আলবানী ও অন্যরা হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

৩. আল-ইন্শায়াত (الإنشاءات) বা নতুন বিষয়। এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চুক্তিসমূহ। এটা দুই প্রকার। যথা—

○ যা উপহাস হিসাবে করলেও কার্যকর হবে এবং শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। এ সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

«ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ»

'তিনটি জিনিস যার প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত হিসাবে ধরা হয় এবং উপহাসকেও প্রকৃত হিসাবে ধরা হয়; তালাক, নিকাহ, রাজ'আত[২৬৭]।'[২৬৮]

অতএব, এই তিন বিষয়ে মানুষ যা বলবে তাই কার্যকরী হবে, অকপটভাবে হোক কিংবা উপহাস হিসাবে হোক এতে কোনো পার্থক্য হবে না।

○ যা উপহাস হিসাবে করলে কার্যকর হবে না; শুদ্ধ বলেও গণ্য হবে না। উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ে ছাড়া অন্যান্য সকল চুক্তি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : ক্রয়- বিক্রয়, লিজ, হিবা প্রভৃতি। যদি কেউ অন্য কোনো লোককে উপহাস করে বলে, এটা তোমার কাছে বিক্রি করলাম তাহলেই বিক্রয় চুক্তি সঠিক হয়ে যাবে না। উপহাসকারীর পক্ষ থেকে সম্মতি না থাকার কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।'[২৬৯]

---

২৬৭. রাজ'আত হচ্ছে : এক তালাক বা দুই তালাকের পর ইদ্দতের সময়ের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা অর্থাৎ যথাবিধি স্ত্রীরূপেই রেখে দেয়া।

২৬৮. ইমাম তিরমিযী, হাদীস নং-১১৮৪; ইমাম আবূ দাউদ, হাদীস নং-২১৯৪; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-২০৩৯। ইমাম তিরমিযী ও অন্যরা হাদীসটি হাসান বলেছেন।

২৬৯. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ২৯।

(ঘ) নির্বুদ্ধিতা السفه **(আস-সাফাহ্)**

'সাফাহ' বলতে বোঝানো হয় সাবালক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মস্তিষ্কে এমন একটি দোষ, যার প্রেক্ষিতে সম্পত্তির আদান-প্রদানে নির্বুদ্ধিমূলক আচরণ করে যা বিবেক-বুদ্ধির চাহিদা বিরোধী। যেমন বলা হয়, নির্বোধ-বোকা সম্পত্তির লেনদেনের জন্য যোগ্য নয়। এটাও উভয় প্রকার আইনভিত্তিক যোগ্যতা বা 'আহলিয়্যাহ'কে বাধাগ্রস্ত করে না। কেননা বোকার 'আক্ল থাকার কারণে পাগল নয়; তাই সে শরী'য়াতের বিধিবিধান পালনে বাধ্য। তবে এই নির্বুদ্ধিতা অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, ফলে তার অর্থনৈতিক লেনদেন স্থগিত রাখা হবে। যতদিন পর্যন্ত সে এই অবস্থায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার সম্পত্তিতে সে লেনদেন করতে পারবে না বরং তার অভিভাবক করবে।[২৭০]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

'আর তোমরা অল্প বুদ্ধিমানদের তাদের ধনসম্পদ অর্পণ কর না; যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জীবন চালানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং তা থেকে তাদের আহার-বিহার ও ভরণপোষণ ব্যবস্থা কর। আর তোমরা তাদের সঙ্গে সদালাপ কর।'[২৭১]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ঋণের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বলেন—

﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾

'অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সংগতভাবে লিখাবে।'[২৭২]

---

২৭০. আল-জুদাই', **তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ**, পৃ. ১০০।

২৭১. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ৫।

২৭২. আল-কুরআন ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৮২।

(ঙ) মত্ততা السكر। (আস-সাকারু)

মত্ততা বলতে বোঝানো হয়, মদ অথবা যেকোনো নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণ করার কারণে 'আক্বল বা মনের অন্তর্ধান কিংবা অদৃশ্য হওয়া। মত্তাবস্থায় মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধি হারায়; যার জন্য সে জানে না নেশা অবস্থায় তার থেকে কি কথা ও কাজ প্রকাশ পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মূলনীতি হলো 'আক্বল স্থবির হওয়ার কারণে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার বুদ্ধি-বিচার থাকে না, ফলে তা 'আহলিয়্যাহ' বা আইনভিত্তিক যোগ্যতায় প্রভাব ফেলবে কি না? এর প্রতিক্রিয়া বুঝতে হলে মত্ততার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং এর প্রেক্ষিতে হুকুমও ভিন্ন হবে।

যদি কেউ বৈধ কারণে নেশাগ্রস্ত হয়। যেমন : চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রতিষেধক হিসাবে মদ কিংবা অন্য কোনো নেশাজাতদ্রব্য গ্রহণ করে, অথবা পানির অভাবে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় এবং ওই অবস্থায় এই ব্যক্তি কোনো কাজ করে তাহলে তার কোনো আইনগত প্রতিক্রিয়া নেই। কেননা চিকিৎসা কিংবা তৃষ্ণায় মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাণ রক্ষার্থে যে উন্মত্ততা আসে তা বেহুশ অবস্থার সমতুল্য। তাই এই অবস্থায় তার আইনভিত্তিক যোগ্যতা থাকে না। ফলে তার ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, তালাক, দান, স্বীকৃতি প্রভৃতি শুদ্ধ হবে না। অবশ্য এ অবস্থায় সে কারও ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট করলে তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কিন্তু কেউ যদি নিষিদ্ধ উপায়ে নেশাগ্রস্ত হয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, তার 'আহলিয়্যা' বা আইনভিত্তিক যোগ্যতা হারায় না। এ ভিত্তিতে সে যে ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান, বিয়ে, তালাক, দান, কর্জ করবে সবগুলো বৈধ ও আইনসিদ্ধ হবে। এতে তার স্বার্থহানি হলেও তার কাজ অশুদ্ধ নয় হারাম কাজ করার কারণে। তবে কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, তার কোনো মৌখিক পদক্ষেপ তথা লেনদেন, আদান-প্রদান, বিবাহ, তালাক, স্বীকৃতি ইত্যাদি শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হবে না; আইনিযোগ্যতার মাপকাঠি 'আক্বল বা বিবেক-বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে।

এই অবস্থায় সে যদি কোনো অপরাধ করে তবে সে অপরাধের জন্য দায়ী হবে। খুন, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, যাই সে করুক না কেন মত্ততার অজুহাতে সে রেহাই পাবে না। আইনের এই নীতির কারণ খুব স্পষ্ট। কেননা মানুষ যখন সাবালক হয়, তখন আইন তাকে সব অধিকার এবং দায়িত্ব

ধারণ এবং বহনের যোগ্যতা দেয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি নিজে স্বেচ্ছায় নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করে তার 'আক্বল বা বিবেক-বুদ্ধির লোপ ঘটায়, তাহলে বুদ্ধির অভাবে তাকে কোনো দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। ইসলাম মানুষকে নেশা করতে হারাম করেছে। সে হারাম অমান্য করে নেশাজাতদ্রব্য গ্রহণ করার পর উন্মত্ত হয়ে অপরাধ করলে উন্মত্ততার কারণে রেহাই পাওয়া ন্যায়সংগত নয়।[২৭৩]

(চ) বলপ্রয়োগ করা, বাধ্য করা الإكراه। (আল-ইকরাহু)

'ইকরাহ' বলতে বোঝানো হয়, কাউকে বলপ্রয়োগ করে এমন কোনো কথা কিংবা কাজ করতে বাধ্য করা যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় করতে কিংবা বলতে সম্মত হতো না, অভিপ্রায়ও করত না। এটা উভয় প্রকার আইনভিত্তিক যোগ্যতা বা 'আহলিয়্যাহ'কে বাধাগ্রস্ত করে না। তবে কিছু বিধানের ক্ষেত্রে এটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত হিসাবে প্রভাব ফেলে। এর দলীল হচ্ছে—আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

'যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানে অটল থাকে সে ব্যতীত যে-কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের ওপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।'[২৭৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«إنَّ اللهَ وضَعَ عنْ أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهُوا عليه»

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মত থেকে ভুল করা, ভুলে যাওয়া এবং যে বিষয়ে বলপ্রয়োগ করে বাধ্য হয় তার গুনাহ উঠিয়ে নিয়েছেন।'[২৭৫]

---

[২৭৩] আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ১০০-১০১; স্যার আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

[২৭৪] আল-কুরআন, ১৬ (সূরা আন-নাহল) : ১০৬।

[২৭৫] ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ২০৪৫, হাদীসটি সহীহ।

অতএব, কেউ যদি সত্যিকারের বাধ্যকর বলপ্রয়োগে নিরুপায় হয়ে কোনো কাজ করে তাহলে আল্লাহ্ এর পাপ এবং শাস্তি দেবেন না।

বলপ্রয়োগ-এর প্রকারভেদ

বলপ্রয়োগ বা ইকরাহকে উসূলবিদগণ তিন প্রকারে[২৭৬] ভাগ করেছেন—

১. পরিপূর্ণ বলপ্রয়োগ

যে বলপ্রয়োগ দ্বারা লক্ষিত ব্যক্তির জীবন কিংবা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা অন্যের জীবন বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাশের বাস্তব হুমকি থাকে, সে বলপ্রয়োগকে বাধ্যকর, চাপদায়ক পরিপূর্ণ বলপ্রয়োগ বা 'ইকরাহ মুলজি' বা 'ইকরাহ তাম' বলা হয়। এ প্রকার বলপ্রয়োগ লক্ষিত ব্যক্তির সম্মত হওয়ার ক্ষমতা ও তার অভিপ্রায় বা এখতিয়ারকে নষ্ট করে।

এ ধরনের বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে লক্ষিত ব্যক্তির কথা ও কাজ-এর প্রকৃতির কারণে তিন ধরনের হুকুম হয়ে থাকে : 'মুবাহ', 'রুখসাত', 'হারাম'। যেমন-

- শূকরের গোশ্ত, মৃতপ্রাণীর গোশ্ত, মদ প্রভৃতি গ্রহণ করতে বলপ্রয়োগ করা হলে তা গ্রহণ করা মুবাহ বা বৈধ।
- যদি কুফুরী কথা উচ্চারণে বলপ্রয়োগ করে, তাহলে অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান রেখে মুখে কুফুরী কথা উচ্চারণে অনুমতি ও রুখসাত রয়েছে। মূলত এটি হারাম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি দয়া ও রহমত করে তাঁর অধিকারে এই ছাড়টুকু দিয়েছেন; ফলে সে যদি রুখসাত গ্রহণ না করে। অর্থাৎ বাধ্য হওয়ার পরেও মুখে কুফুরী শব্দ উচ্চারণ না করে এবং ধৈর্যধারণ করে, এটা তার জন্য উত্তম ও সাওয়াবের।
- কাউকে খুন করতে বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাশ করতে, কিংবা কাউকে ব্যভিচার করতে অথবা পিতামাতাকে প্রহার করতে বলপ্রয়োগ করে, তাহলে এগুলো করার জন্য বলপ্রয়োগের অযুহাত টিকবে না। এগুলো সবসময় হারাম; করলে গুনাহ হবে।

এরপরও যদি খুন করে ফেলে তাহলে কিসাসের শাস্তি কার জন্য প্রযোজ্য হবে, যাকে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে সে, নাকি বলপ্রয়োগকারী?

---

২৭৬. আল-বূরনু, মুহাম্মদ সিদকী ইবনু আহমদ, ***মাউসূয়াতুল কাওয়ায়িদিল ফিক্‌হিয়্যাহ***, খ. ১/২, পৃ. ২৫৬, খ. ৮, পৃ. ১০।

হানাফী মাযহাব মতে, কিসাস আসবে বলপ্রয়োগকারীর ওপর; কেননা সেই প্রকৃত খুনী এবং যার ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে সে খুনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে মাত্র যার কোনো অভিপ্রায় নেই। এটাই গ্রহণযোগ্য মত। অন্যান্য মাযহাব মতে, কিসাস বাস্তবায়ন হবে যাকে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে তার উপর; কারণ সেই খুন করেছে। তেমনইভাবে যদি কারও সম্পদ নষ্ট করে এর ক্ষতিপূরণ হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাব মতে, বলপ্রয়োগকারীকেই বহন করতে হবে; এটিই গ্রহণযোগ্য মত।

মালিকী মাযহাব মতে, যাকে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে তাকে বহন করতে হবে।

শাফি'য়ী মাযহাব মতে, উভয়কেই বহন করতে হবে।

আর এই পরিপূর্ণ বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে যদি 'হদ' শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ করে। যেমন : চুরি, মদ পান, মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি, তাহলে তার কোনো পাপ হবে না এবং 'হদ' শাস্তি বাস্তবায়ন করা হবে না; কেননা পরিপূর্ণ বলপ্রয়োগে বাধ্য হওয়া ব্যক্তির সম্মতি ও অভিপ্রায় অনুপস্থিত থাকে, ফলে এটি একটি গ্রহণযোগ্য সন্দেহ। আর হদ শাস্তি বাস্তবায়নের শর্ত হচ্ছে সন্দেহ না থাকা, হাদীসে এসেছে, সন্দেহের প্রেক্ষিতে 'হদ' বাস্তবায়ন বাদ দিতে।[২৭৭] তবে এই পরিস্থিতিতেও ব্যভিচার করা ব্যক্তির পাপ হবে, কিন্তু 'হদ' শাস্তি হবে না।[২৭৮]

২. অসম্পূর্ণ বলপ্রয়োগ

যে বলপ্রয়োগ করা বলতে লক্ষিত ব্যক্তিকে প্রহার করা, কারারুদ্ধ করা, আটক করা কিংবা সম্পদ নষ্ট করার আশঙ্কা থাকে, তাকে চাপহীন অসম্পূর্ণ বলপ্রয়োগ বা 'ইকরাহ গাইরু মুলজি' বা 'ইকরা নাকিস' বলা হয়। এ প্রকার বলপ্রয়োগ লক্ষিত ব্যক্তির সম্মত হওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে, তবে তার অভিপ্রায় বা এখতিয়ারকে নষ্ট করে না। তাই এ ধরনের বলপ্রয়োগ আইন লঙ্ঘন করার জন্য অজুহাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে সকলের মতেই শূকরের গোশ্ত, মৃতপ্রাণীর গোশ্ত, মদ গ্রহণ করা, ব্যভিচার করা, সম্পদ নষ্ট করার অনুমতি নেই। তেমনইভাবে হানাফীগণের মতে, চুরি করা, অন্তরে ঈমান রেখে মুখে কুফুরী উচ্চারণ করার অনুমতি পাবে না, এরপরও

---

২৭৭. ইমাম তিরমিযী, ***আস-সুনান***, হাদীস নং-১৪২৪।

২৭৮. আল-বুখারী, আলাউদ্দীন, ***কাশফুল আসরার শারহু উসূলিল বাযদাবী***, খ. ৪, পৃ. ৩৮৩; আল-বূরনু, ***মাউসূয়াতুল কাওয়ায়িদিল ফিক্‌হিয়্যাহ***, খ. ১/২, পৃ. ২৫৬, খ. ৮, পৃ. ১০।

করলে তার পাপ হবে এবং শাস্তি হবে। কিন্তু জমহুরের মতে, এগুলো করার অনুমতি পাবে শাস্তিও পাবে না, কারণ এ সম্পর্কিত উল্লিখিত দলীল সব ধরনের বলপ্রয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৩. শিষ্টাচারভিত্তিক বলপ্রয়োগ

হানাফী মাযহাব মতে, যে বলপ্রয়োগ করা বলতে লক্ষিত ব্যক্তির পিতামাতা, কিংবা স্বামী-স্ত্রী, সন্তান অথবা ভাইবোনকে প্রহার করার, কারারুদ্ধ করার, আটক করার আশঙ্কা থাকে, তাকে 'ইকরাহ আদবী' বা শিষ্টাচারভিত্তিক বলপ্রয়োগ বলা হয়, তবে তাঁদের মতে এটা প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীতে 'ইস্তিহসান'[২৭৯] এই বিবেচনায় এটি প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রথম প্রকারের সমস্ত হুকুম এটাতেও প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবে সবদিক দিয়ে এটি দ্বিতীয় প্রকার তথা চাপহীন অসম্পূর্ণ বলপ্রয়োগ 'ইকরাহ গাইরু মুলজি' বা 'ইকরা নাকিস'-এর অন্তর্ভুক্ত।

উসূলবিদগণ বলপ্রয়োগ বা 'ইকরাহ'কে অন্য দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। যথা—

১. ন্যায়সংগত বলপ্রয়োগ

ন্যায়সংগত বলপ্রয়োগ বা 'ইকরাহ বি-হক্ক' যেমন : কোনো ঋণী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য বিচারকের বলপ্রয়োগ বৈধ। ফলে কোনো দেউলিয়া ব্যক্তিকে তার দেনা পরিশোধ করার জন্য আদেশ দেওয়া হলে সেই আদেশের ভয়ে বিক্রয় শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

২. অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ

অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ বা 'ইকরাহ বিগাইরে-হক্ক' যেমন : কুফুরী উচ্চারণের জন্য, খুন করার জন্য, চুরি করার জন্য, বিক্রয় করার জন্য, বিবাহ করার জন্য, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য জুলুম করা। কারণ বলপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়া কাজের অনুপাতে নির্ণয় হয়। কাজ যদি এমন প্রকৃতির হয় যা

---

২৭৯. 'ইস্তিহসান' শব্দের অর্থ হলো—কোনোকিছুকে ভালো বিবেচনা করা। উসূল শাস্ত্রের পরিভাষায় ইস্তিহসান বলতে বুঝানো হয়, কোনো মাস্‌আলায় মুজতাহিদের কাছে কোনো অধিকতর সূক্ষ্ম ও অগ্রাধিকারযোগ্য উপলক্ষ্য থাকার কারণে প্রকাশ্য কিয়াস বা 'কিয়াসে জলী'-এর সিদ্ধান্ত বর্জন করে অপ্রচ্ছন্ন কিয়াস বা 'কিয়াসে খাফী'-এর সিদ্ধান্তগ্রহণ করা, অথবা অধিকতর অগ্রাধিকারযোগ্য উপলক্ষ্য থাকার কারণে সামগ্রিক মূলনীতি কিংবা দলীলের বিপরীতে আংশিক কল্যাণ গ্রহণ করা। (আশ-শাতিবী, ***আল-মুওয়াফাকাত্***, খ. ৫, পৃ. ১৯৪; খল্লাফ, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ১২৭।

বাধ্য হয়ে করলে যে ব্যক্তি তা করে সে ছাড় পাওয়ার যোগ্য, তাহলে সেই কাজ করলে তার আইনগত কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। আর কাজ যদি এমন প্রকৃতির হয় যাকে বলপ্রয়োগের কাজ বলে গণ্য করা হয়, তাহলে ওই কাজের জন্য বলপ্রয়োগকারী দায়ী হবে। যে ব্যক্তির ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে সে দায়ী হবে না। কিন্তু যে কাজের জন্য বলপ্রয়োগকারীকে দায়ী করা যায় না, সে কাজের কোনো কার্যকারিতা থাকে না। এইজন্য জমহুরের মতে বাধ্য হয়ে দোষ স্বীকার করলে কিংবা তালাক দিলে তা কার্যকর হয় না। তবে হানাফীগণের মতে, যেহেতু বলপ্রয়োগ কেবল মানুষের সম্মতিকে নষ্ট করে এখতিয়ার নষ্ট করে না, সেহেতু যেসব লেনদেন কিংবা চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য সম্মতির ওপর নির্ভর করে যেমন : বিক্রয়, দান, লিজ, স্বীকৃতি প্রভৃতি। বাধ্য হয়ে অত্যাচারের ভয়ে এইসব চুক্তি করে ফেললে তা ত্রুটিযুক্ত হবে। কিন্তু এই দোষযুক্ত চুক্তি পরে সমর্থন দ্বারা ত্রুটিমুক্ত করা যায়। তবে যেসব কাজ প্রত্যাহারযোগ্য নয় যেমন : বিবাহ, তালাক, সেসব কাজ বাধ্য হয়ে করলেও কার্যকরী হয়। তাই সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও বলপ্রয়োগের প্রেক্ষিতে বিবাহ করলে কিংবা তালাক দিলে তা কার্যকরী হয়। কিন্তু কোনো কোনো হানাফী ইমাম বলেছেন, বাধ্য হয়ে তালাক উচ্চারণ করলে সেই তালাক গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৮০]

❖ ❖ ❖

---

২৮০. আল-বুখারী, আলাউদ্দীন, ***কাশফুল আসরার শারহু উসূলিল বাযদাবী***, খ. ৪, পৃ. ৩৮৩; আল-বূরনু, মুহাম্মদ সিদকী ইবনু আহমদ, ***মাউসূয়াতুল কাওয়ায়িদিল ফিক্‌হিয়্যাহ***, খ. ১/২, পৃ. ২৫৬; স্যার আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

উৎস থেকে শরী'য়াহ আইন বুঝার কতিপয় পরিভাষা : শব্দ ও এর ব্যবহার বিধি সম্পর্কিত

ইসলামী আইনের মূল উৎস আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহপ্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ থেকে আইনের বিধিবিধান বুঝার জন্য এর ভাষাজ্ঞান অনুধাবন করা আবশ্যক। কারণ মূল উৎস ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ার জন্য এর মূল বক্তব্যের শব্দাবলি ও এর সুনির্দিষ্ট অর্থ, তাৎপর্য সম্পর্কে অবশ্যই সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। এজন্য উসূলবিদগণ উৎস থেকে আইন সংগ্রহ পদ্ধতিতে শব্দগুলোর ধরন ও ব্যবহারবিধি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আইনগত মূল বক্তব্যে শব্দের নিহিতার্থ অনুধাবন করা, শরী'য়াত প্রণেতার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কী ছিল তা নির্ণয় করা শব্দের ব্যাখ্যা ছাড়া অসম্ভব। অতএব, অন্য যেকোনো আইনের মতো ইসলামী আইনের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হলো, যা সহজবোধ্য নয় তা আবিষ্কার করা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে প্রয়োজনীয় অনুমানের বিষয় হিসাবে যা অপ্রকাশিত সে সম্পর্কে শরী'য়াত প্রণেতার উদ্দেশ্য কী তা নির্ণয় করা। তাই উসূলবিদগণ শব্দগুলোকে বিভিন্ন ভিত্তিতে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে–

এক. শব্দসমূহের ব্যাপ্তির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ

শব্দসমূহের ব্যাপ্তির ভিত্তিতে দু'প্রকার। যথা—

(ক) 'আম (العام)

'আম শব্দটি আরবী 'উমুম শব্দ থেকে নির্গত। আভিধানিকভাবে শব্দটি সর্বজনীন, ব্যাপ্তিশীল, সাধারণ, ব্যাপক প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। উসূলবিদদের পরিভাষায় 'আম বলতে বোঝানো হয়, এমন ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শব্দ যা তার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে শামিল করে, যেগুলো একই প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং একসঙ্গে তার জন্য নির্ধারিত। তবে 'আম হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, 'আম শব্দের অন্তর্গত অর্থসমূহ একসঙ্গে অথবা একই মহল থেকে নির্ধারিত হতে হবে। এজন্য যেসব শব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময় কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মহল থেকে নির্ধারিত হয়ে দুই বা ততোধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেসব শব্দ 'আম বা ব্যাপকতা জ্ঞাপক শব্দ হিসাবে বিবেচ্য হবে না। এ ধরনের

শব্দগুলো 'মুশতারাক লাফযী' বা বহু অর্থবোধক শব্দ রূপে বিবেচিত হবে। যেমন : القرء শব্দটি 'তুহর' বা পবিত্র অবস্থা ও 'হায়েয' বা রজঃস্বল অবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ দুটি অর্থ একই সঙ্গে কিংবা একই মহল থেকে নির্ধারিত নয়। কারণ আরবরা কখনো একে তুহর অর্থে ব্যবহার করে, আবার কখনো হায়েয অর্থে ব্যবহার করে। কিংবা তাদের কেউ কেউ এটাকে তুহর অর্থে ব্যবহার করে, আবার কেউ কেউ হায়েয অর্থে ব্যবহার করে। পরবর্তী সময়ে শব্দটি দুটি অর্থেই প্রচলন লাভ করে। এ কারণে শব্দটি 'মুশতারাক' (বহু অর্থবোধক শব্দ)-এ পরিণত হয়। ফলে এই মুশতারাক শব্দ 'আম বা ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা মুশতারাক-এর অন্তর্ভুক্ত, যার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বুঝার জন্য অন্য আলামত বা প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে।[২৮১]

'আম-এর শব্দাবলি

উসূলবিদগণ 'আম চেনার জন্য বহু শব্দ উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাহাবুদ্দীন আল-কারাফী [৬২৬-৬৮৪ হি.] (রহ.) আরবী ভাষায় প্রচলিত 'আম বা ব্যাপক অর্থের ২৫০টি শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকটি উল্লেখ করব;[২৮২]

১. كل / جميع /كافة/عامة (প্রত্যেকেই/ সকলেই/ পুরো) এগুলো কোনো শব্দের আগে বা শেষে যুক্ত হলে তখন যার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় তার সমগ্রটি শনাক্ত করা হয়। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে।'[২৮৩] আল্লাহ্‌র বাণী, ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ 'বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী

---

২৮১. আল-সালামী, 'আয়ায ইবনু নামী, ***উসূলুল ফিক্হ আল-লাযী লা-ইয়াসা-উল ফকীহ জাহলাহু*** (রিয়াদ : দারুত-তাদাম্মুরিয়াহ, ২০05 খ্রি.), পৃ. ২৮৫; ড. আহমদ আলী, ***তুলনামূলক ফিক্হ***, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩০৮।

২৮২. খাল্লাফ, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১৭১; ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী***, খ. ২, পৃ. ৪৯; ড. আহমদ আলী, ***তুলনামূলক ফিক্হ***, খ. ১, পৃ. ৩১৮।

২৮৩. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে 'ইমরান) : ১৮৫।

তোমাদের সকলের প্রতি আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল।'[২৮৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«وكَانَ النَّبِيُّ يُبعثُ إلى قومِهِ خاصَّةً وبُعثتُ إلى النَّاسِ عامَّةً، وفي رواية بُعثتُ إلى النَّاسِ كافة.»

'অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।'[২৮৫]

২. الجمعُ المعرَّفُ بِأل (নির্দিষ্টসূচক আলিফ-লামযুক্ত বহুবচন) যেমন : আল্লাহ্‌র বাণী—﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীদের এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।'[২৮৬] এখানে التوابين ও المتطهرين শব্দ দুটি বহুবচন এবং নির্দিষ্টসূচক আলিফ-লামযুক্ত, তাই এটা ব্যাপকতাজ্ঞাপক বা 'আম হিসাবে চিহ্নিত।

৩. الجمعُ المعرَّفُ بالإضافة (নির্দিষ্টসূচক পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বহুবচন) যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী— ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ 'তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করো।'[২৮৭] এখানে أموال শব্দটি বহুবচন, যা নির্দিষ্টসূচক সর্বনামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে, তাই এটা 'আম হিসাবে চিহ্নিত।

৪. المفردُ المعرَّفُ بأل (নির্দিষ্টসূচক আলিফলামযুক্ত একবচন) যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ 'নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত'।[২৮৮] তবে শর্ত হচ্ছে—এতে ব্যবহৃত আলিফ-লামটি (الاستغراقية) বা সমগ্রব্যাপক হতে হবে, আলিম-লাম (العهدية) নির্দিষ্টসূচক না হতে হবে। এখানে الإنسان শব্দটি সমগ্রব্যাপক ও নির্দিষ্টসূচক আলিফ-লামযুক্ত, তাই এটা 'আম হিসাবে চিহ্নিত।

২৮৪. আল-কুরআন, ৭ (সূরা আল-আ'রাফ) : ১৫৮।
২৮৫. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৩৩৫।
২৮৬. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল- বাকারা) : ২২২।
২৮৭. আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবা) : ১০৩।
২৮৮. আল-কুরআন, ১০৩ (সূরা আল-'আছর) : ২।

৫. النكرة في سياق النفي (অনির্দিষ্টসূচক শব্দ নেতিবাচক অর্থের পর) অনির্দিষ্ট শব্দ যখন না-সূচক অর্থ প্রকাশ করে তার ফলও নেতিবাচক হয়। তখন যার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় তার সমগ্রটি শনাক্ত করা হয়। যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

'ইসলামে কেউ কারও আগ বাড়িয়ে ক্ষতি করবে না, ক্ষতির বদলেও (বিচার ছাড়া) ক্ষতি করবে না।'[২৮৯]

এখানে 'দ্বারার' শব্দটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক, যেহেতু অনির্দিষ্টসূচক শব্দ নেতিবাচকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. مَنْ 'মান' (যে/সে) এ শব্দটি সকল বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন তা শর্তজ্ঞাপক বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তার ফল সাধারণ হয়। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾

'অতঃপর, যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ কোনো ভালো কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।'[২৯০]

'আম-এর হুকুম

কোনো বিষয় 'আম-এর ব্যাপক নির্দেশনা থেকে নির্দিষ্ট করে নেওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক 'আম শব্দ তার ব্যাপক নির্দেশনাজ্ঞাপক হিসাবেই বহাল থাকবে। তবে 'আম তার অন্তর্গত এককসমূহের জন্য অকাট্য বা 'কাতয়ী' হবে নাকি ধারণামূলক 'যন্নী' হবে? এ বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়।

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, 'আম তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের জন্য 'যান্নী' বা ধারণামূলক দলীল হিসাবে পরিগণিত, কারণ তা সীমিতকরণ ও তাবিলের সম্ভাবনা রাখে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্ভাবনা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সুনির্দিষ্ট বা 'কাতয়ী' হবে না। এমনকি 'আম-এর ব্যাপক নির্দেশনা থেকে নির্দিষ্ট করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট এককসমূহের জন্যও 'যান্নী'। অতএব, 'আম নির্দিষ্ট করার পূর্বে ও পরে ধারণামূলক প্রমাণ হিসাবেই গণ্য হবে।

২৮৯. ইমাম ইবন মাজাহ, ***সুনানু ইবন মাজাহ***, হাদীস নং-২৩৪০, হাদীসটি সহীহ।
২৯০. আল-কুরআন, ৯৯ (সূরা আয-যালযালাহ) : ৭।

খাস-এর মতো অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা দেয় না। এজন্য 'আম দ্বারা খাসকে রহিত করা যায় না, পক্ষান্তরে খাস দ্বারা 'আমকে রহিত করা যায়; কারণ 'কাতয়ী' বা অকাট্য সবসময় 'যান্নী' বা ধারণামূলক থেকে শক্তিশালী। তেমনইভাবে যেকোনো 'যান্নী' দলীল দ্বারা 'আম-কে নির্দিষ্ট করা যায়; প্রমাণের বিচারে তাঁদের মতে, 'আম এবং অন্য যেকোনো 'যান্নী' দলীল একই মানের হওয়ার কারণে।[২৯১]

২. হানাফী ইমামদের মতে, 'আম তার অন্তর্গত সকল বিষয়ের জন্য অকাট্য বা 'কাতয়ী' হিসাবে বিধান প্রয়োগ অপরিহার্য করবে, যতক্ষণ না কোনো বিষয় 'আম-এর ব্যাপক নির্দেশনা থেকে তাখ্‌সিস বা নির্দিষ্ট করে নেওয়া হবে। তবে নির্দিষ্ট করে নেওয়ার পর বাকি এককসমূহে 'যান্নী' বা ধারণামূলক হিসাবে গণ্য হবে। রহিতকারী বা 'নাসিখ' হওয়ার জন্য শর্ত হলো 'মানসূখ' বা যেটাকে রহিত করা হবে সেটার সমকক্ষ হওয়া কিংবা উত্তম হওয়া। প্রমাণের দিক দিয়ে যেহেতু 'আম খাসের সমকক্ষ, সেহেতু 'আম দ্বারা খাস রহিত করা যায়, তেমনইভাবে খাস দ্বারা 'আম-কে রহিত করা যাবে।[২৯২]

(খ) খাস্ (الخاص)

'খাস' শব্দটি আরবী 'আল-খুসূস' শব্দ থেকে নির্গত। আভিধানিকভাবে শব্দটি নির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুনির্ধারিত, বিশেষিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি 'আম'-এর বিপরীত। উসূলবিদদের পরিভাষায় 'খাস' এমন শব্দকে বলা হয়, যা এককভাবে নির্দিষ্ট অর্থ কিংবা নির্দিষ্ট নাম বোঝানোর জন্য গঠিত। অন্য ভাষায়, এমন শব্দকে 'খাস' বলা হয়, যাকে পৃথকভাবে স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে।

সুতরাং সুনির্দিষ্ট ও সীমিত অর্থ, কিংবা নির্ধারিত নাম, ব্যক্তি, বস্তু, অথবা জাতি বোঝানোর জন্য গঠনকৃত শব্দকে 'খাস' বলে অভিহিত করা হয়। যেমন : খালেদ একজন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম। মহিলা একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের নাম। ১০ (দশ) একটি সুনির্দিষ্ট সীমিত সংখ্যার নাম; কেননা সংখ্যার শব্দাবলী সামগ্রিকভাবে একক এবং সুনির্দিষ্ট সংখ্যক অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে

---

২৯১. আয-যারকাশী, ***আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ***, খ. ৪, পৃ. ৩৫; আন-নাম্‌লাহ, ***আল-মুহায্‌যাব ফী উসূলিল ফিক্হিল মুকারন***, খ. ৪, পৃ. ১৫১৫।

২৯২. আলাউদ্দীন আল-বুখারী, ***কাশফুল আসরার***, খ. ৩, পৃ. ১০৯; খল্লাফ, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১৭২; ড. আহমদ আলী, ***তুলনামূলক ফিক্হ***, পৃ. ৩২৬।

গঠিত, তাই এগুলো খাস। তেমনইভাবে মানুষ একটি নির্দিষ্ট জাতির নাম হিসাবে খাস।[২৯৩]

খাস-এর হুকুম

খাস শব্দের প্রমাণ তার অর্থের জন্য কাত'ঈ বা অকাট্য। অর্থাৎ কোনোরকম সন্দেহ ছাড়াই খাস অনুসারে আমল করতে হবে; কারণ খাস সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। এটি অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয়।[২৯৪]

'আম ও খাস-এর মধ্যে মতবিরোধ

আল-কুরআনের মূল পাঠে একই ও অভিন্ন বিষয়ে দুটি বিধান থাকলে তার একটি 'আম' ও অন্যটি 'খাস' হলে এবং সে ক্ষেত্রে হানাফী ইমামদের মতে, উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে, কারণ তাঁদের মতে 'আম ও 'খাস' উভয়ই প্রমাণের দিক দিয়ে একই মানের কাত'ঈ বা সুনির্দিষ্ট। তাই তাঁরা মনে করেন, এ ধরনের বিরোধ দেখা দিলে প্রথমেই তাদের মধ্যকার কালানুক্রমিক ক্রম নির্ণয় করতে হবে। যেমন : উভয়ে মাক্কী ও মাদানী আয়াত কিংবা একটি মাক্কী অন্যটি মাদানী আয়াত হতে পারে। যদি উভয়টি পৃথক সময়ে অবতীর্ণ হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে 'আম পরে আসলে তা খাসকে রহিত করবে, কিন্তু খাস পরে আসলে তা 'আমকে আংশিকভাবে মানসূখ করবে। যদি দুটি সমান্তরাল সময়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে খাস 'আমকে 'তাখসীস'[২৯৫] বা নির্দিষ্ট করবে। কারণ, হানাফীগণ মনে করেন, 'আম ও খাস যখন কালানুক্রমিকভাবে সমান হয় কেবল তখনই খাস 'আমকে নির্দিষ্ট করে।

পক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, শুধুমাত্র 'খাস'ই 'কাত'ঈ' তাদের মতে 'আম' হচ্ছে 'যান্নী' এবং যেহেতু 'কাত'ঈ' সবসময়ই 'যান্নী'-এর ওপরের স্তরের, তাই 'খাস' 'আম'-এর ওপরে বহাল থাকবে। অতএব, তাঁরা এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখেন না, কারণ যখন একই বিষয়ে দু'টি বিধান থাকে তখন পরেরটি আগেরটির ব্যাখ্যামূলক এবং উভয়ই বহাল থাকে।[২৯৬]

---

২৯৩. আত্-তাফতাযানী, ***শারহুত-তালবীহ 'আলা-ততাওযীহ***, খ. ১, পৃ. ৬২; খাল্লাফ, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্হ***, পৃ. ১৮০; ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্হিল ইসলামী***, খ. ২, পৃ. ৫৯।

২৯৪. তদেক; আল-জুদাই', ***তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ***, পৃ.২৩২।

২৯৫. তাখসীস অর্থ কোনো ব্যাপক অর্থকে তার বিশেষ অবস্থা বা অবস্থানের সঙ্গে নির্ধারণ করা।

২৯৬. কামালী, মুহাম্মদ হাশিম, মো. সাজ্জাদুল ইসলাম অনুদিত, ***ইসলামি আইনের মূলনীতি*** (ঢাকা : বিআইআইটি, ১ম প্র., ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৫০।

দুই. শব্দের অর্থ স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন বিবেচনায় শ্রেণিবিভাগ

একটি শব্দ কোনো ধরনের ব্যাখ্যা—বিশ্লেষণ ছাড়াই বোধগম্য কোনো ভাবকে বুঝালে তাকে স্পষ্ট শব্দ বলে। স্পষ্ট শব্দে কোনো বিধান প্রকাশ পেলে বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণের আশ্রয় অবলম্বন ছাড়াই তা আইনগত বাধ্যবাধকতার ভিত্তি তৈরী করে। তাই প্রত্যেক স্পষ্ট মূল বক্তব্য স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তাতে বাইরের কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।[২৯৭]

উসূলবিদগণ-এর মধ্যে সার্বিকভাবে দুটি শ্রেণি রয়েছে: এক. ফকীহ উসূলবিদগণ, যারা আগে ফিক্হ রচনা করার পর তাদের ছাত্রগণ সেসব ফিক্হ থেকে উসূল নির্ধারণ করেছেন। দুই. মুতাকাল্লিম উসূলবিদগণ, যারা আগে উসূল নির্ধারণ করে পরে ফিক্হ বিন্যাস করেছেন। শব্দের অর্থ স্পষ্ট হওয়া না হওয়ার বিষয়ে উভয় ঘরনার উসূলবিদগণ মতভেদ করেছেন। মুতাকাল্লিম উসূলবিদ তথা মালেকী, শাফি'য়ী ও হাম্বলী উসূলবিদগণ সেটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

স্পষ্ট হওয়ার দিক থেকে 'যাহির' ও 'নাস'। আর অস্পষ্ট হওয়ার দিক থেকে 'খফী' ও 'মুজমাল'।

অপরদিকে ফকীহ উসূলবিদগণ তথা হানাফী উসূলবিদগণ স্পষ্টতার মাত্রা ও প্রচ্ছন্ন নির্দেশনার দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দকে চার প্রকারে ভাগ করেছেন।[২৯৮] 'যাহির', 'নাস', 'মুফাস্সার' ও 'মুহকাম'। তবে মুতাকাল্লিম উসূলবিদগণের মতে, মুফাস্সার নস-এর অন্তর্ভুক্ত এবং মুহকাম'কে মুতাকাল্লিমরা উসূলের আলোচনায় আনেন না।

বস্তুত, যেহেতু ফকীহগণের ভাগ বেশি ব্যাপক, সে হিসাবে আমরা ফকীহ তথা হানাফী উসূলবিদগণের দেওয়া প্রকার-প্রকরণটিই এখানে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

(ক) যাহির (الظاهر)

'যাহির' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রকাশ্য, স্পষ্ট। এটি 'বাতিন'-এর বিপরীত। উসূলবিদগণের পরিভাষায় 'যাহির' বলতে বোঝানো হয় এমন শব্দ যার নিজস্ব মূল স্পষ্ট অর্থ রয়েছে। কিন্তু তাতে বিকল্প বিশ্লেষণের সম্ভাবনা বা গ্রহণযোগ্য 'তাবীল' করার সুযোগও উন্মুক্ত থাকে। এর কারণ হলো, এটি যে প্রেক্ষাপটে

---

[২৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

[২৯৮] আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২২৯।

ঘটেছে তার সঙ্গে এর অর্থ সংগতিপূর্ণ নয়। অন্য ভাষায়, শব্দের দুটি অর্থের মধ্যে অধিকতর স্পষ্ট অর্থকে 'যাহির' বলে। যেমন : 'আমি একটি সিংহ দেখেছি' এই বাক্যে 'সিংহ' শব্দটি স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সম্ভাবনা থেকে যায় যে, বক্তা এ কথার দ্বারা একজন সাহসী ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন।[২৯৯]

(খ) নাস্ (النص)

'নাস' শব্দের আভিধানিক অর্থ মূল বক্তব্যের নির্ধারিত স্পষ্ট ভাষ্য। উসূলবিদগণের পরিভাষায় 'নাস্' বলতে বোঝানো হয়, এমন শব্দ যার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় এবং যে প্রেক্ষাপটে তা প্রকাশ পায় তার সঙ্গেও তা সংগতিপূর্ণ হয়। কিন্তু তারপরও তা 'তাবীল'-এর সম্ভাবনা রাখে। যেমন : আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। আমাদের সঙ্গে অল্প পরিমাণ পানি থাকে। এ পানি দিয়ে যদি আমরা ওযু করি তবে পানি শেষ হয়ে যাবে আমরা পিপাসায় কষ্ট পাব। এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং সমুদ্রের মৃতপ্রাণীও হালাল।'[৩০০]

এ হাদীসের মূল প্রেক্ষাপট– সাগরের পানি, সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–'সমুদ্রের পানি পবিত্র' এটি স্পষ্ট এবং উক্ত পানি পবিত্র হওয়া সম্পর্কে 'নাস্'।

যাহির ও নাস্-এর মধ্যে পার্থক্য

যাহির ও নাস্ দুটিই স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। তবুও এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর তা হলো—যে প্রেক্ষাপটে তা প্রকাশ পায় তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ 'যাহির' মূল পাঠে পাওয়া বিধানের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় মূল প্রতিপাদ্যও নয়। পক্ষান্তরে নাস্ মূল পাঠে পাওয়া বিধানের মূল প্রতিপাদ্য এবং তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

---

[২৯৯] আন-নাম্লাহ, *আল-মুহায্যাব ফী উসূলিল ফিক্হিল মুকারন*, খ. ৩, পৃ. ১২০১; আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২৯৪; কামালী, মুহাম্মদ হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

[৩০০] ইমাম আন-নাসায়ী, *সুনান আন-নাসায়ী*, হাদীস নং-৫৯, হাদীসটি সহীহ।

তাবীল-এর পরিচয়

তাবীল বলতে সাধারণত তিনটি অর্থ বুঝায়;

১. তাফসীর বা ব্যাখ্যা। যেমন : ইবনু আব্বাসের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর মধ্যে এসেছে, 'আল্লাহ আপনি তাকে তাবীল শিক্ষা দিন।' অর্থাৎ তাফসীর শিক্ষা দিন।

২. যেকোনো জিনিসের সর্বশেষ অবস্থা যা দাঁড়ায়। যেমন : আল্লাহর বাণীতে এসেছে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, হে প্রিয় পিতা, এটা আমার স্বপ্নের সর্বশেষ পরিণতি।'

৩. প্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ। এ অর্থটি উসূলবিদরা পরিভাষা হিসাবে আবিষ্কার করেছেন।

তাবীল দু'প্রকার–

○ তাবীল সহীহ বা বিশুদ্ধ তাবীল। যা কোনো গ্রহণযোগ্য দলীল নির্ভর তাই বিশুদ্ধ তাবীল।

○ তাবীল ফাসিদ বা অশুদ্ধ তাবীল। যা কোনো গ্রহণযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে হয় না। অথবা মনগড়া হয়।[৩০১]

(গ) মুফাস্‌সার (المفسر)

'মুফাস্‌সার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—ব্যাখ্যাকৃত, সুস্পষ্ট, বিশ্লেষণমূলক, বর্ণনামূলক।

পারিভাষিক অর্থে 'মুফাস্‌সার' বলতে বোঝানো হয়, যা 'নাস্'-এর থেকে অধিক স্পষ্ট এবং এতে 'তাবীল' ও 'তাখসীস'-এর সম্ভাবনা থাকে না; তবে এ স্পষ্টতা নাস্-এর মধ্যে নিহিত কোনো আভাষের কারণেও হতে পারে, কিংবা নাস-এর বহির্ভূত অন্য কোনো প্রমাণের কারণেও হতে পারে, যা তার অস্পষ্টতা অথবা অন্যান্য সম্ভাবনাকে দূরীভূত করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾

'তখন ফেরেশতারা প্রত্যেকেই আর সকলেই সাজদা করলেন।'[৩০২]

---

৩০১. আল-মিনয়াবী, আবুল মুনযির, *আশ-শারহুল কাবীর লি-মুখতাসারিল উসূল মিন 'ইলমিল উসূল* (মিসর : আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ১ম প্র., ১৪৩২ হি.-২০১১ খ্রি. পৃ. ৬৫)।

এ আয়াতে ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ শব্দ দ্বারা ফেরেশতাগণের সাজদা করার প্রসঙ্গটা এমনভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ফেরেশতার সাজদা করার ব্যাপারে কোনোরূপ অস্পষ্টতা নেই।

মুফাস্‌সার ও মুয়াওয়্যাল-এর মধ্যে পার্থক্য

'মুফাস্‌সার' এবং 'মুয়াওয়্যাল' উভয়টি 'নাস্'-এর ব্যাখ্যা, তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'মুফাস্‌সার' হচ্ছে—শরী'য়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যাকৃত এবং এজন্য এর হুকুম কাত'ঈ বা অকাট্য। আর 'মুয়াওয়্যাল' হচ্ছে—ইমামদের ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকৃত, কাজেই এটা কাত'ঈ নয়।[৩০৩]

(ঘ) মুহকাম (المحكم)

আভিধানিকভাবে 'মুহকাম' শব্দটির অর্থ– অটল, সুদৃঢ়, অনঢ়, ইত্যাদি।

পারিভাষিকভাবে 'মুহকাম' বলতে বোঝানো হয়, এমন স্পষ্ট বক্তব্য যা মুফাস্‌সরের চেয়ে সুদৃঢ় ও অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এর মর্ম এতই সুদৃঢ় যে, এর বিপরীত অর্থ নেওয়া জায়েয নেই এবং এতে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন, কিংবা রহিতকরণ-এর সম্ভাবনা থাকে না। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।'[৩০৪]

এ আয়াতটির বক্তব্য এতটাই সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও অকাট্য যে, এতে কোনোরূপ 'তাবীল', 'তাখসীস' ও 'নাসখ' বা রহিতকরণ-এর সম্ভাবনা নেই এবং এ আয়াতটি ইসলামের মৌলিক আক্বীদা হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে।[৩০৫]

---

৩০২. আল-কুরআন, ১৫ (সূরা আল- হিজর) : ৩০।

৩০৩. আল-জুদাই', *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃ. ২৭৩।

৩০৪. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২৯। এর মাধ্যমে বুঝা গেল যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, কিন্তু তার জ্ঞানের প্রকৃতস্বরূপ তিনি ব্যতীত কেউ জানেন না। তাই আল্লাহর সিফাতসংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ মুহকাম-এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর অর্থ আমরা জানি, কিন্তু ধরন ও প্রকৃতস্বরূপ জানি না।

৩০৫. খল্লাফ, ***'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ১৬৮; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ৯২; ড. আহমদ আলী, ***তুলনামূলক ফিক্‌হ***, খ. ১, পৃ. ৩৯২।

এই 'মুহকাম' সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

'তিনিই আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকাম, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ।'[৩০৬]

তিন. অর্থ অস্পষ্ট ও অপ্রচ্ছন্ন বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

(ক) 'খফী' (الخفي)

আভিধানিকভাবে 'খফী' শব্দটির অর্থ—অস্পষ্ট, গোপন, ঝাপসা, আবছা, দুর্বোধ্য, অপরিস্ফুট ইত্যাদি।

উসূলুল ফিক্হের পারিভাষায় 'খফী' বলতে এমন বক্তব্যকে বোঝানো হয়, যার মর্ম ও উদ্দেশ্য কোনো আনুষঙ্গিক বিষয় বা 'আরিদ' (অস্থায়ীভাবে আপতিত) কোনো কারণে অস্পষ্ট থাকে। এ অস্পষ্টতা বক্তব্যে ব্যবহৃত শব্দের কারণে হয় না, বরং শব্দের নির্দেশনা প্রচ্ছন্ন। অস্পষ্টতা তৈরি হয় বাক্যে বর্ণিত কথার মর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আনুষঙ্গিক হুকুম নিরূপণ করতে অতিরিক্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজনের কারণে। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বাণী,

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।'[৩০৭]

এ আয়াতের শব্দ ও অর্থ স্পষ্ট। এ ভিত্তিতে এ আয়াতটি 'যাহির' বা প্রকাশ্য। কিন্তু এ আয়াতের প্রেক্ষিতে কাফনচুরির সাজা হিসাবে কাফনচোরের হাত কাটা হবে কি না বিষয়টি পরিষ্কার নয়। কারণ, আরবী ভাষায় কাফনচোর বোঝানোর জন্য পৃথক নাম 'নাব্বাশ' (نَبَّاش) প্রচলিত রয়েছে। আবার উপর্যুক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'সারিক' (চোর) শব্দ কাফনচোরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, কাফনচোরের জন্য যেমন 'সারিক' (চোর) শব্দের ব্যবহার প্রযোজ্য

৩০৬. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে-ইমরান) : ৭।

৩০৭. আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মা'য়িদা) : ৩৮।

হতে পারে তেমনইভাবে 'নাব্বাশ' শব্দটিও প্রচলিত। তবে কাফনচোরের জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহারের কারণ হচ্ছে—কাফনচোর ও অন্যান্য চোরের মধ্যে প্রকৃতি ও অবস্থাগত পার্থক্য আছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি বলেন, 'সারিক' (চোর) হলো, যে মালিক কিংবা পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে সম্পদ কুক্ষিগত করে। আর কাফনচোরের বেলায় এ অর্থ প্রযোজ্য নয়। কেননা কাফনধারী ব্যক্তি মৃত হওয়ার কারণে তার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। এ সন্দেহের অবকাশের কারণে অধিকাংশ হানাফী ইমামদের মতে, কাফনচোরের হাত কাটা যাবে না; যেহেতু সন্দেহ থাকলে 'হদ' (নির্ধারিত শাস্তি) বাস্তবায়ন না করার স্পষ্ট বর্ণনা হাদীসে এসেছে; তাই তাঁরা এই আয়াতের প্রচ্ছন্ন নির্দেশনাকে এক্ষেত্রে আমলে নেননি।[৩০৮] কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ট ইমামদের মত হচ্ছে, কাফনচোরের হাত কাটা হবে; যেহেতু চোরের সব ধরনের বিশেষণ কাফনচোরের মধ্যে বিদ্যমান, সুতরাং এ আয়াতের প্রচ্ছন্ন নির্দেশনা কাফনচোরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।[৩০৯]

(খ) মুশকাল (المشكل)

'মুশকাল' শব্দের আভিধানিক অর্থ অতীব অস্পষ্ট, সন্দেহযুক্ত, জটিল। পারিভাষিকভাবে মুশকাল বলতে বোঝানো হয়, যে বাক্যের মর্ম খুব অস্পষ্ট ও সংশয়যুক্ত; যা অন্য কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়া বোঝা যায় না। এর নিগূঢ়ার্থ নিরূপন করতে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা বা গবেষণার প্রয়োজন দেখা দেয়।[৩১০] এ অস্পষ্টতা দু'কারণে হয়–

৩০৮. আল-বুখারী, আলাউদ্দীন, ***কাশফুল অসরার***, খ. ২, পৃ. ৩৬; ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দীন, ***ফাতহুল কাদীর*** (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি.), খ. ৫, পৃ. ৩৭৪; ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৩; হাদীসটি হচ্ছে : "ادرأوا الحدود بالشبهات" অর্থাৎ 'সন্দেহের অবকাশ থাকলে তোমরা দণ্ডকে প্রতিহত করবে' ইমাম তিরমিযী, হাদীস নং- ১৪৪৪; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং- ২৫৪৫। হাদীসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও ইমামগণ হাদীসটির অর্থ 'আমল করার পর্যায়ের বলে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। অনেকে এ প্রসঙ্গে 'ইজমা'ও বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজর, এই হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন। দেখুন : ***তালখিসূল হাবীর***, খ. ৪, পৃ. ৫৬; আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনু আলী, ***নাইলুল আওতার***, (কায়রো : দারুল হাদীস, ১৯৯৩ খ্রি.) খ. ৭, পৃ. ১২৫।

৩০৯. আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ২৭৬।

৩১০. আল-বুখারী, আলাউদ্দীন, ***কাশফুল অসরার***, খ. ১, পৃ. ৫২; আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, ***আল-ওয়াজিয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী***, খ. ১, পৃ. ১১২; আল-জুদাই', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

১. পূর্বোল্লিখিত 'মুশতারাক' বা বহু অর্থবোধক শব্দের কারণে। যেমন : আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

'আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন 'হায়েয'/'তুহর' পর্যন্ত।'(৩১১)

এখানে القرء শব্দটি 'তুহর' বা পবিত্র অবস্থা ও 'হায়েয' বা রজঃস্বলা অবস্থা দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ দুটি অর্থ একই সঙ্গে কিংবা একই মহল থেকে নির্ধারিত নয়। শব্দটি দুটি অর্থেই প্রচলন লাভ করার কারণে এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বুঝার জন্য অন্য আলামত বা প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে। যার জন্য এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে ভিন্ন দুটি মত তৈরি হয়েছে।(৩১২)

২. দুটি দলীলের বাহ্যিক অসংগতির কারণে। যেমন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী,

«لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ» ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ , فَمَا بَالُ الْإِبِلِ يَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبْيُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا، قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ»

(স্বয়ংক্রিয়ভাবে) 'সংক্রমণ ব্যাধি বলতে কিছু নেই, সফর মাসে ও পেঁচার ডাকে কোনো অশুভতা বলে কিছু নেই। সে সময় জনৈক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে সে উট পালের কী অবস্থা, যা কোনো মরুভূমিতে থাকে যা দেখতে যেন হরিনী (ব্যাধিমুক্ত বলবান)। অতঃপর সেখানে খোস-পাঁচড়া আক্রান্ত কোনো উট এসে তাদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের সবগুলোকে পাঁচড়ায় আক্রান্ত করে দেয়? তিনি বললেন, তাহলে প্রথম উটটিকে কে সংক্রমিত করেছিল?।'(৩১৩)

অন্য হাদীসে এসেছে,

---

৩১১. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারা) : ২২৮।

৩১২. আল-সালামী, 'আয়ায ইবনু নামী, ***উসূলুল ফিক্হ আল-লাযী লা-ইয়াসা-উল ফকীহ জাহলাহু***, পৃ. ২৮৫।

৩১৩. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-২০২২; ইমাম মুসলিম, ***সহীহ মুসলিম***, হাদীস নং-৫৬৮১।

«وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»

'কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন কর যেমন তুমি সিংহ থেকে পালিয়ে থাকো।'(৩১৪)

উভয় হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক অসংগতি দৃশ্যমান; প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে, সংক্রামক বা ছোঁয়াচে বলতে কোনো রোগ নেই। দ্বিতীয় হাদীসে কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে বলা হচ্ছে। মূলত উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো অসংগতি নেই। প্রথম হাদীসে ছোঁয়াচে বলতে কিছু নেই এর মর্মার্থ হচ্ছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো রোগের এই ক্ষমতা নেই যে, কাউকে সংক্রমণ করবে। তবে আল্লাহর হুকুম হলে কোনো রোগীর সংস্পর্শের মাধ্যমে সেই রোগ নতুন করে কারও মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া প্রথম হাদীসে জাহিলী যুগের সেই বিশ্বাসকে অপনোদন করা হয়েছে যা তারা বিশ্বাস করত যে, রোগীর সংস্পর্শে এ রোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। এ ধরনের বিশ্বাস করা শিরক ও কুফুরী বিশ্বাস। সেই প্রচলিত বিশ্বাসকে উক্ত হাদীসে নাকচ করা হয়েছে; যার জন্য ওই হাদীসের স্পষ্ট এসেছে, 'তাহলে প্রথম উটটিকে কে সংক্রমিত করেছিল?।'

অপরদিকে দ্বিতীয় হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্র হুকুম হলে কোনো রোগীর সংস্পর্শের কারণে অন্যের মধ্যে সেই রোগ সৃষ্টি হতে পারে বিধায় এ ধরনের রোগী থেকে দূরে থাকতে বা পালাতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়টি করোনাকালে আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অনেক জায়গায় করোনা ভাইরাস–কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসক সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে যথাযথভাবে চিকিৎসা দেওয়ার পরও আক্রান্ত হয়েছে, অথচ কোনো ধরনের প্রটেকশন ছাড়াই উক্ত করোনা পজিটিভ স্বামীর সেবা করেও স্ত্রীর করোনা নেগেটিভ!(৩১৫) তাই মহান আল্লাহ্ কর্তৃক কোনো রোগ দেওয়ার ফায়সালা না হলে, কোনো ব্যক্তি কোনো রোগীর সংস্পর্শে থাকলেও সেই রোগ তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না, বরং প্রথম উটটিকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কোনো কিছুর সংক্রমণ বাদে নতুনভাবে রোগাক্রান্ত করেছেন, ঠিক তেমনইভাবে পরেরগুলোও আল্লাহ্র হুকুমেই রোগাক্রান্ত হয়েছে। প্রত্যেক মুমিনকে এ বিষয়টি এভাবেই বিশ্বাস করতে হবে, এটাই প্রকৃত বাস্তবতা। কিন্তু এ বাস্তবতা যথাযথ উপলব্ধি না করে শুধু বাহ্যিক অসংগতি দেখে কিংবা

---

৩১৪. ইমাম বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, হাদীস নং-৫৭০৭।

৩১৫. *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা : ৮ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি.।

বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্ট হয়ে কেউ হয়তো বিশ্বাস করতে পারে যে, সেই রোগীর সংস্পর্শে আসার কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার মধ্যে সেই রোগটি তৈরি হয়েছে, এরূপ ধারণা হতে পারে, ফলে তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ কারণে এমন ঈমানী সংশয়ে অবতীর্ণ হওয়া থেকে নিজেকে দূরে ও সাবধানে রাখার জন্য দ্বিতীয় হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এভাবেই উভয় ধরনের দলীলের বাস্তবায়ন ও 'আমল সম্ভব।

মুশকাল-এর হুকুম

মুশকালের হুকুম হচ্ছে, মুজতাহিদ এই অস্পষ্টতা দূর করে উদ্দিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে চিন্তা এবং গবেষণা করে অন্যান্য দলীলের সাহায্যে উক্ত অস্পষ্টতা ও সন্দেহ দূর করবে।[৩১৬]

(গ) মুজমাল (المجمل)

'মুজমাল' শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত, কুঞ্চিত, সংকুচিত, সামগ্রিকভাবে। উসূলবিদদের মতে—

- 'আল-মুজমাল' বলতে বোঝানো হয়, এমন কথা যার মর্ম এমন অস্পষ্ট যে, শুধু শব্দ দ্বারা কিংবা আলামত দ্বারা বোঝা যায় না, বরং এ অস্পষ্টতা দূর করতে হলে অবশ্যই বক্তার ব্যাখা-বিবরণের প্রয়োজন হয়। যেমন : যেসব শর'য়ী শব্দ ও পরিভাষার মর্ম ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শরী'য়াত প্রণেতার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া বোঝা যায় না। যথা—'সালাত', 'যাকাত', 'সাওম' ও 'হজ্জ'। কেননা, এ শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ শরী'য়াতের উদ্দেশ্য নয় এবং কুরআন-সুন্নাহ'য় এগুলো প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন করার আদেশ শরী'য়াত প্রণেতার বিস্তারিত বিবরণ ব্যতীত কেবল শাব্দিক অর্থ দ্বারা জানা সম্ভব নয়। কাজেই এ শব্দগুলো 'মুজমাল'। পরে শরী'য়াত প্রণেতা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর মাধ্যমে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দান করেন। এতে করে তার অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়।[৩১৭]

৩১৬. আল-জুদাই', আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ, ***'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ২৭৯।

৩১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭৯-২৮০।

- 'মুজমাল' বিরল অস্পষ্ট শব্দাবলির কারণেও হতে পারে। যেমন— আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾

  'করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি? যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়।'[৩১৮]

এই আয়াতে 'আল-ক্বারি'য়াহ' (القارعة) শব্দটি বিরল হওয়ার কারণে অস্পষ্ট। কাজেই আয়াতে উল্লেখিত 'আল-ক্বারি'য়াহ' শব্দটি 'মুজমাল'। আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে এর বর্ণনা না দিলে এই শব্দ দ্বারা কী উদ্দেশ্য, তা জানা সম্ভব ছিল না।

এরূপ 'মুজমাল' শব্দের অস্পষ্টতা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে কুরআন-সুন্নাতে-এর ব্যাখ্যা-বিবরণ (البيان) তালাশ করতে হবে।[৩১৯]

মুজমাল ও মুশকাল-এর মধ্যে পার্থক্য

অস্পষ্টতার বিবেচনায় যদিও মুজমাল এবং মুশকাল মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, 'মুশকাল-এর অস্পষ্টতা আনুষঙ্গিক বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা কিংবা বাহ্যিক আলামতের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। পক্ষান্তরে, 'মুজমাল'-এর অস্পষ্টতা চিন্তা-গবেষণা করে দূর করা সম্ভব নয়, বরং বক্তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিবরণের মাধ্যমেই কেবল দূরীভূত করা সম্ভব হয়।[৩২০]

(ঘ) মুতাশাবিহ (المتشابه)

'মুতাশাবিহ' শব্দটি আভিধানিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, জটিল, অস্পষ্ট প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক অর্থে 'মুতাশাবিহ' হচ্ছে, এমন বাক্য যার সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য শব্দ কিংবা আলামত দ্বারা বোঝার উপায় নাই। অর্থাৎ এমন অস্পষ্টতা যা দূর করার আশা করা যায় না; কারণ এর সঠিক মর্মার্থ, তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। যেমন কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সূরার শুরুতে কিছু বিচ্ছিন্ন বর্ণ

৩১৮. আল-কুরআন, ১০১ (সূরা আল-ক্বরিয়াহ) : ১-৩।

৩১৯. আল-জুদাই', ***তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্‌হ***, পৃ. ২৮০-২৮১।

৩২০. আল-সারাখসী, মুহাম্মদ ইবনু আহমদ, ***উসূলুস-সারাখসী***, (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তা. বি.) খ. ১, পৃ. ১২৬; ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৪।

রয়েছে; যথা– الم، طه، يس এগুলোকে (الحروف المقطعات) বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা বলে। এ সাংকেতিক বর্ণগুলোর অর্থ, মর্মার্থ কিংবা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। 'মুতাশাবিহ' সম্পর্কে অল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

'তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কুরআনের আসল অংশ। আর কিছু আয়াত রয়েছে মুতাশাবিহ; সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারাই ফিতনা তৈরি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ-এর ব্যাখ্যা-তাৎপর্য অনুসরণ করে। অথচ সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।'[৩২১]

'মুতাশাবিহ'-এর হুকুম হচ্ছে—এগুলোর ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় সত্য এবং এগুলোর তাৎপর্য আল্লাহ্ই জানেন—এ বিশ্বাস করা।[৩২২]

❖ ❖ ❖

[৩২১]. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে-ইমরান) : ৭।

[৩২২]. আল-জুদাই', *তাইসির 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ২৮১; ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৪।

শেষ কথা

ফিক্হের জ্ঞানকে কুরআন ও সুন্নাহয় সর্বোত্তম জ্ঞান হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর উসূলুল ফিক্হ হচ্ছে এমন একটি জ্ঞান যা ফিক্হকে নিয়ন্ত্রণ করে, সঠিক পথে পরিচালিত করে, এ পথের ভুলভ্রান্তি নিরসণে সহায়তা করে। সুতরাং যারা উসূলুল ফিক্হের জ্ঞান রাখবে না, তাদের জন্য ফিক্হ সুদূর পরাহত বিষয়। যেমন–

যারাই দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে ব্রতী হবে তাদেরকে অবশ্যই উসূলুল ফিক্হ পড়তে হবে। ইসলামী জ্ঞানের চাবিকাঠি হচ্ছে আরবী ভাষা। কারণ আরবী ভাষাতেই কুরআন ও হাদীস। আরবী ভাষাতেই ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ। আরবী ভাষার দখল না থাকলে এসব ইসলামী জ্ঞান লাভ করা দুরূহ ব্যাপার। যারা আরবী ভাষা জানে না, তাদেরকে উসূলুল ফিক্হ সম্পর্কে সামান্য তথ্য-উপাত্ত প্রদানের জন্য আমার এ প্রয়াস।

হাজারো উসূলুল ফিক্হের কিতাব শত শত বিষয়বস্তু থেকে চয়ন করে কয়েকটি দিক এ গ্রন্থে তুলে ধরেছি, যাতে শরী'য়ার বিধানসমূহের নিয়ামাবলি তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরিভাষার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। তবে অন্য ভাষায় পরিভাষা অনুবাদ করলে তা পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না, অনেক সময় তা আরও জটিল আকার ধারণ করে। তারপরও সাধারণ ছাত্র ও জনগণের দিকে তাকিয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি।

এতে যা-কিছু ভালো করতে পেরেছি তার সবই আল্লাহর তাওফীক, আর যা ভুল তা একান্তই আমার নিজের। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা থেকে মুক্ত।

পরিশেষে দু'আ করি, আল্লাহ যেন দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন, ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন ও এর মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দান করেন। তিনিই তো তাওফীকদাতা ও তা করতে সক্ষম। আমীন! আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। তাঁর দয়াতেই সকল উত্তম কাজ সুসম্পন্ন হয়। সালাত ও সালাম পেশ করছি তাঁর নবী ও রাসূল, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ওপর, তাঁর সাহাবী ও পরিজনের প্রতি।

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থটি রচনায় যেসব গ্রন্থ ও গবেষণা থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে কিংবা উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা প্রদান করা হলো।

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু 'উমর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৪১৯ হি.।

৩. ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, ও আল-বাজী, আবুল ওয়ালিদ, *শারহুল মুয়াত্তা*, মিসর : মাতবা'য়াতুস সা'য়াদাহ, ১ম প্র., ১৩৩২ হি.।

৪. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, কায়রো : দারুল হাদীস, ১ম প্র., ১৯৯৫ খ্রি.।

৫. আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, *আল-জামি'আস-সাহীহ*, বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.।

৬. মুসলিম, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সাহীহ*, বৈরূত : দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.।

৭. আবূ দাউদ, সুলাইমান, *আস-সুনান*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.।

৮. আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবনু 'ঈসা, *আস-সুনান (আল-জামি'উল কবীর)* মিসর : মাতবা'য়াতু মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় প্র., ১৯৭৫ খ্রি.

৯. ইবনু মাজাহ, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ, *আস-সুনান*, কায়রো : ঈসা আল বাবী আল-হালাবী, তা. বি.।

১০. আল-ফাইয়ূমী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী, *আল-মিসবাহুল মুনির*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

১১. আল-জুরজানী, আলী ইবনু মুহাম্মদ, *আত-তারীফাত*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৮৩ খ্রি.।

১২. আল-জুদা'ই, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, *তাইসিরু 'ইলমি উসূলিল ফিক্হ*, বৈরূত : মুয়াস্সাতুর রাইয়্যান- ১৯৯৭ খ্রি.।

১৩. ইবনু মানযূর, মুহাম্মদ ইবনু মুকাররাম আল-আফরীকী, *লিসানুল 'আরাব*, বৈরুত: দারু সাদির, ৪র্থ প্র., ২০০৪ খ্রি.।

১৪. মেছবাহ, মাওলানা আবু তাহের অনূদিত *'আল-হিদায়া'*-এর ভূমিকা; *ফিক্হ শাস্ত্রের কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯৮ খ্রি.।

১৫. আল-আ-মিদী, সাইফুদ্দীন আলী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, তা. বি.।

১৬. আস-সুবকী, তাকী উদ্দীন, *আল-ইবহাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.।

১৭. আয-যারকাশী, বাদরুদ্দীন, *আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিক্হ*, বৈরূত : দারুল কুতুবী, ১৯৯৪ খ্রি.।

১৮. ---, *আল-মানসূর ফিল-কাওয়াদিল ফিক্হিয়্যাহ*, কুয়েত: ওজারাতুল আউকাফ, ২য় মু., ১৯৯৪ খ্রি.।

১৯. ---, *তাশ্নীফুল মাসামি' বি-জাম্য়ি'ল জাওয়ামি'*, কায়রো : মাকতাবাতু কুরতুবা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি.।

২০. স্যার আব্দুর রহীম, গাজী শামছুর রহমান অনূদিত, *ইসলামী আইনতত্ত্ব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্র., ১৯৮০ খ্রি.।

২১. আল-জুওয়াইনী, ইমামুল হারামাইন, *আল বুরহান ফী উসূলিল ফিক্হ*, মিসর: দারুল ওয়াফা, ৪র্থ প্র., ১৪১৮ হি.।

২২. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, *আল-মাহসূল*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭ খ্রি.।

২৩. আল-আলওয়ানী, তাহা জাবির, মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার অনূদিত, *ইসলামী উসূলে ফিক্হ*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৯৬ খ্রি.।

২৪. আন-নাম্লাহ, আব্দুল করীম ইবন আলী, *আল-মুহাযযাব ফী উসূলিল ফিক্হিল মুকারন*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯ খ্রি.।

২৫. ---, *আল-জামি' লি-মাসায়িলি উসূলিল ফিক্‌হ ওয়া তাতবিক্বাতুহ আ'লাল মাযাহিবির রাজিহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্র., ২০০০ খ্রি.।

২৬. অধ্যাপকবৃন্দ, শরীয়াহ ও আইন অনুষদ, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, *মুজাক্কারাতু উসূলিল ফিক্‌হ*, মিসর : ১৯৬৩ খ্রি.।

২৭. আয-যুহাইলী, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা, *আল-ওয়াজীয ফী-উসূলিল ফিক্‌হিল ইসলামী*, দামিশ্‌ক : দারুল খাইর, ২০০৬ খ্রি.।

২৮. ---, *আল-কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হিয়্যাহ ওয়া তাতবিক্বাতুহ আ'লাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, দামিশ্‌ক : দারুল ফিক্‌র, ২০০৬ খ্রি.।

২৯. আল-কারাফী, শাহাবুদ্দীন, আহমদ ইবনু আহমদ, *আল-ফুরূক; 'আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়ায়িল ফুরূক*, বৈরূত : 'আলমুল কুতুব, তা. বি.।

৩০. ---, *আয্‌-যাখীরাহ*, বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৪ খ্রি.।

৩১. আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশ্‌বাহ ওয়ান-নাযায়ির*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.।

৩২. খাল্লাফ, আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, *'ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ*, মিসর : মাতবায়াতুল মাদানী, তা. বি.।

৩৩. আল-আযহারী, মুহাম্মদ ইবন আহমদ, *তাহযীবুল লুগাহ*, বৈরূত : দারু ইহয়ায়িত তুরাস, ২০০১ খ্রি.।

৩৪. আর-রাযী, যাইনুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু আবু বকর, *মুখতারুস সিহাহ*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ৫ম প্র., ১৯৯৯ খ্রি.।

৩৫. কাযী আবূ 'ইয়ালা, মুহাম্মদ ইবনুল হোসাইন, *আল-'উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিক্‌হ*, রিয়াদ : ১৪১০ হি.- ১৯৯০ খ্রি.।

৩৬. আল-হাম্বলী, ইবনু রজব, *জামি'উল উলূমি ওয়াল হিকাম*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ৭ম প্র., ২০০১ খ্রি.।

৩৭. আল-হানাফী, আমীর বাদশাহ, *তাইসিরুত তাহরীর*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.।

৩৮. আল-হিন্দী, সফিউদ্দীন মুহাম্মদ, *নিহায়াতুল ওসূল ফী দিরায়াতিল উসূল*, মক্কা : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি.।

৩৯. আল-মিনয়াবী, মাহমূদ ইবন মুহাম্মদ, *আশ-শারহুল কবীর লি মুখতাসারিল উসূল মিন 'ইলমিল উসূল*, মিসর : আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ১ম প্র.-২০০১ খ্রি.।

৪০. আবূ যাহ্‌রাহ, মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ, *উসূলুল ফিক্‌হ*, কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৫৮ খ্রি.।

৪১. আল-আনসারী, যাকারিয়া ইবনু মুহাম্মাদ, *গায়াতুল উসূল ফী লুব্বিল উসূল*, মিসর : দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, তা. বি.।

৪২. আত-তূফী, সুলাইমান, *শারহু মুখতাসারির রাউদাহ*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্র., ১৯৮৭ খ্রি.।

৪৩. ইব্রাহীম মোস্তফা ও অন্যরা, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, কায়রো : মাজমাউল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, দারুদ দাওয়াহ, তা. বি.।

৪৪. কালা'আজী, মুহাম্মদ রাওয়াস, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, জর্দান : দারুন নাফায়িস, ১৯৮৮ খ্রি.।

৪৫. আল-গাযালী, আবূ হামেদ, *আল-মুস্তাস্‌ফা*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৯৩ খ্রি.।

৪৬. আল-হাইসামী, নূরুদ্দীন, *মাওয়ারিদুয যামআন*, দামিশ্‌ক : দারুস সাকাফাহ, ১ম প্র., ১৯৯০-১৯৯২ খ্রি.।

৪৭. আল-আশকার, মুহাম্মাদ ইবনু সোলাইমান, *আফ'আলুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া দালালাতিহা 'আলাল আহকাম*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ৬ষ্ঠ প্র., ২০০৩ খ্রি.।

৪৮. আল-জাস্‌সাস, আহমদ ইবনু আলী, *আল-ফুসূল ফিল-উসূল*, কুয়েত : ধর্ম মন্ত্রানালয়, ২য় প্র., ১৯৯৪ খ্রি.।

৪৯. আল-মারদাওয়ী, আলাউদ্দীন, *আত-তাহবীর শারহুত তাহরীর*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্র., ২০০০ খ্রি.।

৫০. ইব্‌নু তাইমিয়্যাহ, তাকীউদ্দীন, *মাজমু' আল-ফাতাওয়া*, মদীনা : বাদশাহ ফাহাদ আল-কুরআন কমপ্লেক্স, ১৪১৬ হি.।

৫১. আবু হাবীব, ড. সা'দী, *আল-কামূসুল ফিক্হী*, দামিশ্ক : দারুল ফিক্র, ২য় প্র., ১৯৮৮ খ্রি.।

৫২. আশ-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবন আলী, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন 'ইলমিল উসূল*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম প্র., ১৯৯৯ খ্রি.।

৫৩. ---, *নাইলুল আওতার*, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৯৯৩ খ্রি.।

৫৪. আত-তাফ্তাযানী, সা'দ উদ্দীন মাসউদ ইবনু উমর, *শারহুত-তালওয়ীহ 'আলাত তাওযীহ*, মিসর : মাকতাবাতু সাবীহ, তা. বি.।

৫৫. আল-আনসারী, মুহাম্মদ ইবনু নিযাম, *ফাওয়াতিহুর রাহামূত শরহু মুসাল্লামিস-সুবুত*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ২০০২ খ্রি.।

৫৬. ইবনু কাইয়্যিম আল-জাউযিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইবন আবু বকর, *'ইলামুল মুয়াক্কী'ঈন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৯১ খ্রি.।

৫৭. আল-ওয়াকীলী, মুহাম্মদ, *ফিক্হুল আউলাওয়িয়্যাত : দিরাসাতুন ফী-যযাওয়াবেত*, ভার্জিনিয়া : আল-মা'হাদুল আ'লামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১ম প্র., ১৯৯৭ খ্রি.।

৫৮. আল-ফাইরোযাবাদী, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু ইয়া'কুব, *আল-কামূসুল মুহীত্ব*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৯৮৩ খ্রি.।

৫৯. আল-'উসাইমিন, মুহাম্মদ ইবনু সালেহ, *আল-উসূল মিন 'ইলমিল উসূল*, মিসর : দারু ইবনিল জাউযি, ৪র্থ প্র., ২০০৯।

৬০. আল-বাজী, আবুল ওয়ালিদ, *শারহুল মুয়াত্তা*, মিসর : মাতবা'য়াতুস সা'য়াদাহ, ১ম প্র., ১৩৩২ হি.।

৬১. আয্-যুহাইলী, ড. ওয়াহাবাহ, *উসূলুল ফিক্হ*, দামিশ্ক : দারুল ফিক্র, ১ম প্র., ১৯৮৬ খ্রি.।

৬২. আল-আনসারী, যাকারিয়া ইবনু মুহাম্মাদ, *হাশিয়াতুশ শারবীনী 'আলা-ল গুরারিল বাহীয়্যাহ*, মিসর : আল-মাতবাআতুল মাইমুনিয়্যাহ, তা. বি.।

৬৩. আদ্-দুময়াতী, আবু বকর উসমান ইবনু মুহাম্মাদ, *'ইয়ানাতুত তালেবীন আলা হাল্লি আলফাযি ফাতহিল মুঈন*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১ম প্র., ১৯৯৭ খ্রি.।

৬৪. আল-হার্‌রানী, আব্দুস-সালাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আল মুহাররার ফীল ফিক্হি 'আলা মাযহাবিল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৯৮৪ খ্রি.।

৬৫. ইবনু নাজ্জার, তাকিউদ্দীন, *শারহুল কাউকাবিল মুনীর*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল 'ওবাইকান, ২য় প্র., ১৯৯৭ খ্রি.।

৬৬. ইবনু 'আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন, *রদ্দুল মুহতার আলা-দদুর্‌রিল মুখতার*, রিয়াদ : দারু আ'লমিল কুতুব, ২০০৩ খ্রি.।

৬৭. মুহাম্মদ ইবনু হিব্বান, *সহীহু ইবন হিব্বান*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্র., ১৯৯৩ খ্রি.।

৬৮. আল হাত্তাব, শামছুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মালিকী, *মাওয়াহিবুল জালীল ফী-শারহি মুখতাসারিল খলীল*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৯৯২ খ্রি.।

৬৯. ইমাম শাফি'য়ী, মুহাম্মদ ইবনু ইদ্রিস, *আল-উম্ম*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯০ খ্রি.।

৭০. ইবনু আবিল ইয্ আল-হানাফী, *শারহুত ত্বাহাওয়িয়্যাহ*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তাহকীক: শু'য়াইব আল-আরনাউত, ১০ম প্র., ১৯৯৭ খ্রি.।

৭১. আশ-শাতিবী, ইব্রাহীম ইবনু মূসা, *আল-মুওয়াফাকাত্*, দারু ইবন আফ্‌ফান, ১ম প্র., ১৯৯৭ খ্রি.।

৭২. ইবনু কুদামা, মুয়াফফাকুদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ, *আল-মুগনী*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১ম প্র., তা. বি.।

৭৩. ---, *রওদ্বাতুন না-যির*, কায়রো : মুয়াস্‌সাসাতুর রাইয়্যান, ২য় প্র., ২০০২ খ্রি.।

৭৪. আল-বুখারী, আলাউদ্দীন, *কাশফুল আসরার শারহু উসূলিল বায্দাবী*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা. বি.।

৭৫. ইবনু নুজাইম, যাইনুদ্দীন ইবন ইব্রাহীম, *আল-আশ্‌বাহ ওয়ান-নাযায়ের*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.।

৭৬. আল-বূরনু, মুহাম্মদ সিদকী ইবনু আহমদ, *মাউসূয়াতুল কাওয়ায়িদিল ফিক্‌হিয়্যাহ*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২০০৩ খ্রি.।

৭৭. আল-'আস্‌কালানী, আহমদ ইবনু আলী, ইবন হাজর, *ফাতহুল বারী*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.।

৭৮. ---, *তালখিসুল হাবীর*, দারু আদ্বওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্র., ১৪২৮ হি./ ২০০৭ খ্রি.।

৭৯. আয-যুহাইলী, ড. ওয়াহবাহ, *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ৪র্থ প্র., তা. বি।

৮০. আল-মালিকী, ইবনু আব্দিল বার, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, সৌদি আরব : দারু ইবনিল জাওযি, ১ম প্র., ১৯৯৪ খ্রি.।

৮১. আয-যাহাবী, শামছুদ্দীন, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্র., ১৯৮৫ খ্রি.।

৮২. আত-তুয়াইজুরী, আব্দুল-লতীফ ইবনু আব্দুল্লাহ, *তাতাব্বু'উর-রুখাস বাইনাশ-শার'য়ি ওয়াল ওয়াকি'য়ি*, রিয়াদ : মাজাল্লাতুল বায়ান, ১ম প্র., ২০০৯ খ্রি.।

৮৩. আন-নাবাভী, ইয়াহয়া ইবনু শরফ, *আল-মাজমু'উ শারহুল মুহায্‌যাব*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি.।

৮৪. আস-সুবকী, তাজুদ্দীন, *জাম'উল জাওয়ামি'*, কায়রো : মাতবা'তু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৯৬ হি.।

৮৫. কারারাতু মাজমা'য়িল ফিক্‌হিল ইসলামী, *মাজাল্লাতু মাজমা'য়িল ফিক্‌হিল ইসলামী*, ওআইসি, সংখ্যা-৮।

৮৬. আহমদ ইয়্যু 'ইনায়াহ, *আর-রুখাস আল-ফিক্‌হিয়্যাহ ফী যাওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.।

৮৭. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাউসূয়াতুল ফিক্‌হিয়্যাহ*, কুয়েতঃ ওয়াক্‌ফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দারুস্ সালাসিল, ১৪০৪ হি.।

৮৮. মুহাম্মদ ইবনু ইব্রাহীম ও অন্যরা, *মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিল ইসলামী*, মিসরঃ বাইতুল আফকার আদ-দাউলিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৪৩০ হি., ২০০৯ খ্রি.।

৮৯. আল-বায্যার, আহমদ ইবনু 'আম্‌র, *মুসনাদুল বায্যার*, আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারা : মাকতাবাতুল 'উলুমি ওয়াল হিকাম, ১ম প্র., ১৯৮৮ খ্রি.।

৯০. আল-কাসানী, আলাউদ্দিন, *বাদায়িউ'স সানায়ি'*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.।

৯১. আল-আব্দারী, মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৯৪ খ্রি.।

৯২. আশ্‌-শারবীনী, শামছুদ্দিন, *মুগনিল মুহতাজ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৪১৫ হি., ১৯৯৪ খ্রি.।

৯৩. আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশ্‌বাহ ওয়ান-নাযায়ের*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম মু., ১৯৯০ খ্রি.।

৯৪. আল-সালামী, আয়ায ইবনু নামী, *উসূলুল ফিক্‌হ আল-লাযী লা-ইয়াসা-উল ফকীহ জাহলাহু*, রিয়াদ : দারুত-তাদাম্মুরিয়াহ, ২০০৫ খ্রি.।

৯৫. ড. আহমদ আলী, *তুলনামূলক ফিক্‌হ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামী ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৮ খ্রি.।

৯৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৪ খ্রি.।

৯৭. কামালী, মুহাম্মদ হাশিম, মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম অনূদিত, *ইসলামি আইনের মূলনীতি*, ঢাকা : বিআইআইটি, ১ম প্র., ২০১৪ খ্রি.।

৯৮. ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দীন, *ফাতহুল কাদীর*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি.।

৯৯. আল-আলূসী, শাহাবুদ্দীন, *রূহুল মা'আনী*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৪১৫ হি.।

১০০. আল-মিনয়াবী, আবুল মুনযির মাহমূদ, *আশ-শারহুল কাবীর লি-মুখতাসারিল উসূল মিন 'ইলমিল উসূল*, মিসর : আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ১ম প্র., ১৪৩২ হি., ২০১১ খ্রি.।

SHARIAH RULES: PRINCIPLES AND APPLICATIONS

by

DR. MOHAMMED NASIR UDDIN

গ্রন্থ পরিচিতি

জ্ঞান-গবেষণার উন্নতির এই যুগে যখন প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই শর'য়ী বিধান বা 'হুকমে শর'য়ী' সম্পর্কে বিশদ আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম; মুসলিম হিসাবে জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'য়াহর বিধিবিধান জানা অপরিহার্য। মুসলিমরা জীবন পরিচালনার পথে নানা সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধান কীভাবে করবে, তারই পথিকৃৎ হচ্ছে 'হুকমে শর'য়ী'। এ ছাড়া দৈনন্দিন ইসলামী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

এ গ্রন্থে 'শর'য়ী বিধান'-এর আদ্যোপান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামী আইনের বিধানাবলিকে বুঝার জন্য কুরআন-সুন্নাহর মূল বক্তব্যের শব্দাবলি ও এর সুনির্দিষ্ট অর্থ, তাৎপর্য, পটভূমি, ব্যবহারবিধি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু উসূলী পরিভাষা উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি এটি যেহেতু 'উসূলুল ফিক্হ'-সংক্রান্ত গ্রন্থ সেহেতু এতে 'উসূলুল ফিক্হ'-এর পরিচিতি, আলোচ্য বিষয়, উপকারিতা, 'উসূলুল ফিক্হ' ও 'কাওয়া'য়িদুল ফিক্হ'-এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকৃত গবেষণা রীতিনীতির আলোকে নিরপেক্ষভাবে মৌলিক ও আধুনিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির সাহায্যে সহজভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাকতাবাতুল হাসান